বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনার স্বরূপ (১৯৭২-১৯৯৮)

এহছানি খানম

465302

Dhaka University Library
465302

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
অক্টোবর ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

465302

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এহছানি খানম কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনার স্বরূপ (১৯৭২-১৯৯৮)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

০০. ১১. ২০১১

(আবুল কাসেম ফজলুল হক)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য 'বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনার স্বরূপ (১৯৭২-১৯৯৮)' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ রচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক এর তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। বর্তমান অভিসন্দর্ভ পরিকল্পনার শুরু থেকে সামগ্রিক বিষয় বাস্তবায়নে তিনি সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর সাথে আলোচনালব্ধ দিকনির্দেশনা ছিলো আমার গবেষণার প্রধান অবলম্বন।

অভিসন্দর্ভ রচনার সময় যাঁরা আমাকে নিরন্তর পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ইডেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মাহফুজা চৌধুরী, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর স্বপ্না রানী সাহা, বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর নূরজাহান বেগম এবং ইডেন কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ উল্লেখযোগ্য। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

465302

আমার দুই ভাই আহমেদ আবু সালেহ ও আহমেদ আবু ইনসাফের অনুপ্রেরণায় আমি এই গবেষণাকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইডেন মহিলা কলেজ গ্রন্থাগার, কলেজের বাংলা বিভাগ সেমিনার গ্রন্থাগার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

যাঁর অনুপ্রেরণা, পরামর্শ, সহযোগিতা ও নিরন্তর তাগিদ ব্যতীত এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না তিনি আমার জীবনসঙ্গী আব্দুল হাসিব চৌধুরী। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা বা ঋণ স্বীকারের নয়। এই গবেষণাকর্ম চলাকালে আমার শিশু সন্তান মাইশা রাইদাহ চৌধুরী ও আয়মান হাসিব চৌধুরী ধৈর্যের সঙ্গে অনেকখানি ক্ষতি স্বীকার করেছে। আজ সকলের কথাই মনে পড়ছে।

এহ্ছানি খানম
৩০.১০.২০১১

(এহছানি খানম)
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অবতরণিকা		৫
প্রথম অধ্যায়	: উপন্যাস ও বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিক	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	: মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনা (১৯৭২-১৯৮০)	২৮
তৃতীয় অধ্যায়	: মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনা (১৯৮১-১৯৯০)	৬৭
চতুর্থ অধ্যায়	: মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনা (১৯৯১-১৯৯৮)	১০৯
উপসংহার		১৩৩
গ্রন্থপঞ্জী		১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

'বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনার স্বরূপ (১৯৭২-১৯৯৮)' গবেষণাকর্মের এই শিরোনামের দিকে দৃষ্টি দিলেই একটি প্রশ্ন সামনে আসে, 'মহিলা ঔপন্যাসিক' কেন? কেনই বা শুধু মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে উপস্থাপিত জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনার স্বরূপ অনুসন্ধান?

এক দশক আগের কথা। নারী বিষয়ে নানা পাঠের মধ্য দিয়ে নারী সাহিত্যিকদের লেখালেখি নিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রবল আগ্রহ। বেগম রোকেয়ার রচনাবলী পাঠে হঠাৎ একদিন নারী শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত প্রতিবাদী চিন্তাবিদ রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনকে তাঁর উপন্যাস 'পদ্মরাগ'-এ পাওয়া গেল ভিন্ন রূপে, ব্যতিক্রমী বৈভবে। 'পদ্মরাগ' রচিত হয় কালের সেই সন্ধিক্ষণে যখন একটি শতাব্দী অস্তাচলে এবং আরেকটি সবে উন্মীলিত হচ্ছে।[১] ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের বহুমুখী রশ্মিধারাকে নিজ মননের স্ফটিক খণ্ডে ধারণ করবার ক্ষমতা ছিল রোকেয়ার, ক্ষমতা ছিল তার সংঘাতগুলো তুলে ধরার, সমন্বয় ঘটানোর, প্রয়োজন হলে অতিক্রম করার। সেই শক্তিতেই 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে রোকেয়া তারিণী ভবনের মাধ্যমে সৃষ্টি করলেন সাম্যবাদী, শোষণ মুক্ত, ধর্ম, জাতি, শ্রেণী, বংশের লেবাস পরিত্যাগ করে কর্মজীবী নারী হয়ে ওঠার একটি অভিনব নারী জগৎ। স্বামীকে ভালবাসা সত্ত্বেও পদ্মরাগের স্বামীর ঘর করার অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে নারীর অভিনব জীবনজিজ্ঞাসার। এ সমস্ত মতাদর্শ উপস্থাপন উপন্যাসের সাহিত্যরস খর্ব করলেও সে কালের নারীর ঐতিহাসিক আধুনিক চিন্তা জগৎকে উদ্ভাসিত করেছে। তুলে ধরেছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, পুরাতন ও নতুন চিন্তার দ্বন্দ্বকে। মূর্ত করেছে নারীর কাঙ্ক্ষিত আদর্শ সমাজকে।

মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য একমাত্র মহিলা সাহিত্যিক চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ বাল্মিকী বা কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ থেকে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হয়েছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে রাম হয়ে গেছেন প্রান্তিক, কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে সীতাকে। সীতার আত্মকথনের আঙ্গিকেই বর্ণিত হয়েছে কাহিনী। অন্তঃপুরে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতে নারী যে যন্ত্রণা ভোগ করতো, সেই নিঃসঙ্গতা, একাকীত্বের ছবি সীতার চরিত্রে স্পষ্ট। সীতার আত্মহননের মধ্য দিয়েই পরিসমাপ্তি হয়েছে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কাহিনী। পৌরাণিক রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে রামকে চরম প্রজাহিতৈষী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন পৌরাণিক রামায়ণ রচনাকারগণ। অথচ চন্দ্রাবতী সীতার অগ্নিপরীক্ষার এই

Dhaka University Institutional Repository

লজ্জাজনক ও অপমানজনক বিষয়টিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন তাঁর কাব্যে। বরং পাষণ্ড ও সন্দেহপ্রবণ স্বামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রামকে।

এখানে প্রাধান্য পেয়েছে নারীর অভিজ্ঞতা। কাহিনী বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণেও নারীর প্রাধান্য সুস্পষ্ট। এভাবে নারী সাহিত্যিকদের রচনাতেই নারীর আপন জীবন বিস্তৃত পরিসরে, উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

নারী ও পুরুষের রয়েছে স্বতন্ত্র সত্তা। একই সামাজিক গণ্ডির মধ্যে বসবাস করলেও জীবনের চাওয়া-পাওয়ায়, অনুভবে-উপলব্ধিতে, বোধ-রুচিতে, জৈবিক আকাঙ্ক্ষায় নারী পুরুষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এমনকি জীবনযাপন প্রণালীতে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। একই পরিবারের সদস্য নারী পুরুষের জীবনোপলব্ধি ও জীবনদৃষ্টি এক নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিও পৃথক। এ কারণেই মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে এই পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় অন্বেষণ প্রয়োজন। কারণ উপন্যাসেই জীবনের বিশাল ব্যাপ্তি ও বিস্তারকে ধারণ করে জীবন ও সমাজ রূপায়িত হয়। আর ঠিক এ কারণেই মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে পাওয়া যেতে পারে নারীর স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয়।

একটি মানবিক সমাজে নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ এটি আধুনিক মানুষের অন্যতম জিজ্ঞাসা। অন্যান্য আরো অনেক প্রশ্নের সাথে নারী পুরুষের সম্পর্কের নানা প্রশ্নের মীমাংসার মধ্য দিয়েই নির্মিত হবে একটি মানবিক সমাজ। আধুনিক জীবনে নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তির উপর নির্ভর করছে সে সমাজের বিকাশ। তাই নারী পুরুষের মিল অমিল, ঐক্য স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা জরুরী।

সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁরা বলেছেন, আবহমানকাল ধরেই সাহিত্যে নারী পুরুষ উভয়ের জীবন প্রতিফলিত হয়ে আসছে। তবে নারীর লেখায় নারী যেভাবে উপজীব্য হয়েছে, পুরুষের লেখায় নারী সেভাবে উপস্থাপিত হয় নি। সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থেও নারী লেখকের তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নারীবাদীরা তাই এখন বলছেন, পুরুষই যেহেতু সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছে, সাহিত্য রচনা করেছে, সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে, সাহিত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে, সেহেতু সাহিত্যে নারীর কোন স্থান হয়নি অথবা তাকে অনুল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

নারীবাদীদের এ অভিমত গ্রহণ করলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কোন যুগে মেয়েরা পুরুষ ঔপন্যাসিকের মতো মহৎ সৃষ্টির গৌরব অর্জন করতে পারে নি। এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন মহিলা ঔপন্যাসিকেরা। তারা নিজেরাও নিজেদের মতো করে খুঁজেছেন এর উত্তর। বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন, "যুগ যুগান্তর ধরিয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এ সম্বন্ধে নীচের ন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাদিগকে সমান শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা হইতেছে– সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহারা যে পুরুষ অপেক্ষা হীন হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য নহে। কিছুকাল ধরিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানলাভের সমান অধিকার দাও, বিদ্যাবুদ্ধির সমান চর্চা করিতে দেও, তখনো যদি তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির অভাব দেখা যায়– তখন বোঝা যাইবে– তাহারা প্রকৃতপক্ষে পুরুষাপেক্ষা বুদ্ধি হিসেবে জাতিগত নিকৃষ্ট।"[৩]

তবে এসব যুক্তি মেনে নিয়েও সেকালের নারী সাহিত্যিকেরা শিল্প সৃষ্টিতে মেয়েদের অনুজ্জ্বল স্বাক্ষর নিয়ে পীড়া অনুভব করেছেন। অনুসন্ধানে দেখেছেন– কোন কলাসৃষ্টির জন্য যে অখণ্ড আত্মোপলব্ধি একান্ত আবশ্যক, সেই আত্মোপলব্ধির অবকাশ ক'জন মেয়ের জীবনে আসে? নিজেকে স্বতন্ত্রসত্তা বলে স্বীকার করবার সাহসই বা হয় কজনের, তদানুসারে আপনার জীবন পরিচালনা তো দূরের কথা।[৪]

তবে একথাও সত্য, নিজের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করার কোনো সুযোগই ছিল না মেয়েদের। সে সময়ে দীর্ঘদিন ধরে অকর্ষিত ছিল তাদের মনোভূমি, পঙ্গু হয়ে ছিল তাদের মনস্বিতা। তাছাড়া নারী-পুরুষের যাপিত জীবনের প্রভেদও বিস্তর। নারী শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পেলেও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায় না সহজে। তাই ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী দেবী, যিনি স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ পাননি, দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, ২৫ বছর বয়সে স্বামীর অকাল মৃত্যুতে ছয় সন্তান নিয়ে যাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল বাবার বাড়িতে এবং শুরু করেছিলেন সাহিত্যচর্চা, তিনি তাঁর 'নারী জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে বলেছেন, "বিরাট স্রষ্টা হওয়া মেয়েদের ভাগ্যে নেই। মেয়েরা কোথায় পাবে সেই অখণ্ড অবসর পুরুষের মতো– সঙ্গ, সঙ্গী, জ্ঞান, সাধনা, কল্পনাচর্চা ও দেশদেশান্তর ভ্রমণ, অভিজ্ঞতা ও আনন্দ অর্জনের নানাবিধ সুযোগ, বিশাল বিপুল যথেষ্ট সুযোগ। বিশেষত সৎ ও অসৎ হবার সুযোগ ও ভালো-মন্দ দুই-ই হবার সুযোগ? প্রকৃতি মেয়েদের সে সুযোগ দেয়নি, তাই সে অবসর তাদের দেবে না সমাজ, দেবেন না অভিভাবকেরাও, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো মেয়েরা নিতেও পারবে না। নিতে গেলে হয় অরক্ষিত কুমারী জীবন, নইলে নিঃসন্তান বিধবা বন্ধ্যা খণ্ডিত জীবন অথবা সমাজ বহির্ভূত গণিকা নারীর জীবনযাত্রা তার নিতে হবে। অত মূল্যে মেয়েরা এই প্রতিভা অর্জনের স্বাধীনতা কিনতে পারবে না।"[৫]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে সাহিত্যচর্চার জন্য নারীর একটি ঘরের কোণ, একটু নিশ্চিত অবাধ অবসরের অভাবও অনুভব করেছেন নারী সাহিত্যিকরা। ভার্জিনিয়া উলফ বলেছেন, 'a room of one's won', বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন বলেছেন, 'গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণ কুটির নাই।' নিজ গৃহকোণের অপ্রাপ্যতা যেমন তেমনি গৃহিনীর দায়িত্ব ও দায়ও নারীর সাহিত্যচর্চায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সংসার আর সাহিত্য জীবনের সমান্তরাল স্রোত সমান ছন্দে বহমান রাখতে সংসারের 'সকলের সব চাহিদা বহিরঙ্গ সত্তাটির সব দাবি মিটিয়ে' তারপরেই অন্তরঙ্গ সত্তার পরিচর্চা চলতো নিশুতি রাতে। তবে এই অবস্থা অনেকখানি পাল্টে গেছে বিগত শতকে। পুরোপুরি নারীর স্বাধীন সত্তার বিকাশ আজও সম্ভব হয়নি। তবে এ বিষয় নিয়ে নড়াচড়া বেড়েছে অনেকগুণ। বহির্জগতের সাথে নারীর পরিচয় নিবিড় হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে নারীর অধঃস্তন অবস্থানের বিরুদ্ধে ঘোষিত হচ্ছে তীব্র প্রতিবাদ।

দীর্ঘদিন পুরুষের অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী ঊনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে ক্রমশঃ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বারবার নারী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। নারী নিজেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কখনো পরিবারের ভেতর থেকে কখনো সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তবে সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকেই সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বস্তুবাদী চিন্তার প্রসারে নারীর অধঃস্তন অবস্থানের অনড়তা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে। নারীর অধঃস্তন অবস্থানের বিরোধিতা করে এ সময়েই কিছু কিছু লেখার সন্ধান পাওয়া যায়। এসব লেখা বা উচ্চারণ ছিল খুব সীমিত গণ্ডির মধ্যে। তবে ফরাসী বিপ্লব, ইউরোপে শিল্প বিপ্লব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাস প্রথা বিরোধী আন্দোলন, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ভারতীয় উপমহাদেশে সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীর সমানাধিকার ও নারী মুক্তি চেতনা বিকশিত হতে থাকে।

১৯৬০-এর দশকে নারী মুক্তি আন্দোলন কয়েকটি ধারায়, স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। যারা নারীর অধঃস্তনতাকে নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের ফল হিসেবে দেখেছেন তারা রেডিক্যাল ফেমিনিস্ট হিসেবে পরিচিত হোন। বিপ্লবী নারীবাদীরা কোন সংস্কারের মধ্য দিয়ে নয় বরং সমাজের আমূল পরিবর্তন বা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য ও নিপীড়নের অবসান হবে বলে বিশ্বাস করেন। রেডিক্যাল নারীবাদ বা বিপ্লবী নারীবাদ তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও বেশিসংখ্যক নারীকে স্পর্শ করেছে উদারনৈতিক নারী আন্দোলনের ধারা। এই ধারা নারী প্রশ্নকে সামাজিক,

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ও শ্রেণী প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন হিসেবে উপস্থাপন করে। আর নারীবাদী এই সব চিন্তাধারা ও সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আজ এ বিষয়টি স্পষ্ট 'নারী' প্রশ্নটি নারী নামে পরিচিত মানুষের নিছক কিছু অধিকার বা আর্তনাদের বিষয় নয়। এই প্রশ্ন সামাজিক মানুষকে, নারী ও পুরুষকে তাদের খুব ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে ব্যাপক সামাজিক চিন্তা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রকে নাড়া দিতে পারে, প্রশ্নের সম্মুখীন করতে পারে।[৬]

বহির্বিশ্বের এই প্রেক্ষাপটে ১৯৬০-এর দশকে আমাদের দেশেও শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে ১৯৭০-এর গণআন্দোলনেই নারীর অংশগ্রহণ প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। নারী প্রশ্ন নিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক ধারায় দৃষ্টিগ্রাহ্য নড়াচড়া দেখা যায় ১৯৮০-এর দশকের শেষে। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে নারী বর্ষ ও ১৯৭৬-৮৬ কালকে নারী দশক ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পুঁজি প্রবাহে 'নারী উন্নয়ন' বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে নারী বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং গার্মেন্টস শিল্পই প্রথম উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মেয়েকে শিল্প শ্রমিক পরিচয়দান করে। অন্যদিকে মধ্যবিত্তের উপর স্বাধীনতাউত্তর কালে যে রকম অর্থনৈতিক চাপ পড়ে তাতে তার পক্ষে এক পুরুষের আয় নির্ভর পারিবারিক কাঠামো টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। একদিকে অর্থনৈতিক চাপ অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ পেশাজীবী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। নারী সম্পর্কে মধ্যবিত্তের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাঙন ধরে। সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তন নারীর ভেতরে নিজস্ব বোধ যেমন বৃদ্ধি করে, তেমনি পুরনো পারিবারিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তাদের এই বিকাশ মানসিক ক্ষেত্রে, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে টানাপড়েনের সৃষ্টি করে। সন্তান ধারণের জন্য অনেক সময় কাজ হারাতে হচ্ছে নারী শ্রমিককে। সন্তান বাসায় রেখে উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে পেশাজীবী নারীকে। সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক নারীকেই তার স্বাতন্ত্র্যবোধ বা চেতনাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই নারী ঔপন্যাসিক এই পৃথক অভিধার মধ্য দিয়ে নারীর স্বতন্ত্র সত্তার, আপন জীবনোপলব্ধির অন্বেষণ গবেষণার দাবি রাখে। নারী পুরুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট উপন্যাস লিখেন তা বিচার্য বিষয় নয়। তাছাড়া আমাদের পুরুষ ঔপন্যাসিকেরা তাদের লেখনিতে যে নারীকে উপস্থাপন করেছেন তা কোনোভাবেই ন্যূন নয়। বঙ্কিমের গড়া আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, ভ্রমর, রোহিণী, শৈবলিনী, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, রবীন্দ্রনাথের হেমনলিনী, বিনোদিনী, সুচরিতা, ললিতা, কুমুদিনী,

Dhaka University Institutional Repository

দামিনী, বিমলা, লাবণ্য, শর্মিলা, ঊর্মিমালা, শরৎচন্দ্রের অভয়া, কিরণময়ী, বিলাসী, ললিতা, রাজলক্ষ্মী, অচলা, পার্বতী, রমা, সাবিত্রীর মধ্য দিয়ে সে কালের নারীর অসাধারণ শক্তি, তেজস্বীতা, দীপ্তি, আত্মোপলব্ধি, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব সকল কিছুই লেখনির প্রবল শক্তিতে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে নারীর এমন কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা একান্তভাবেই তার। যেখানে নারী ঔপন্যাসিকরা তাঁর নিজস্ব এই অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করতে পেরেছেন, সেখানেই জোর পেয়েছে তাঁদের উপন্যাস।

এ সকল বিবেচনা থেকেই স্বাধীনতাউত্তর কালের মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে নারীর স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা, সময়ের ভাঙন, স্বপ্ন, বাস্তবতা কিভাবে ও কতটা উজ্জ্বলতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে, বিশ্বজুড়ে আলোচিত, আলোড়িত নারীবাদী মতাদর্শ তাদের রচনায় উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য 'বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনার স্বরূপ (১৯৭২-১৯৯৮)' এই বিষয়টি গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার পরিসরকে খুব বিস্তৃত না করে ও সুসংহত করার লক্ষ্যে এই সময়কালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ জন মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের পর্যালোচনাতেই গবেষণাকর্ম সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। গবেষণার সময়কালে রচিত যে উপন্যাসগুলি আলোচনাভুক্ত করা হয়েছে তা তিনটি দশকে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে।

- অবতরণিকা
- ১ম অধ্যায়: উপন্যাস ও বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিক
- ২য় অধ্যায়: মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনা (১৯৭১-১৯৮০)
- ৩য় অধ্যায়: মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনা (১৯৮১-১৯৯০)
- ৪র্থ অধ্যায়: মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনা (১৯৯১-১৯৯৮)
- উপসংহার
- গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ২০০৭), পৃ. ২০৭

২। সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ২০০৭), পৃ. ১১

৩। সুদক্ষিণা ঘোষ, *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা* (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; ২০০৮), পৃ. ১২

৪। ঐ

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৬। আনু মুহম্মদ, *নারী পুরুষ ও সমাজ* (সন্দেশ, ঢাকা; ২০০৫), পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

উপন্যাস ও বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিক

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে অঙ্কিত হয় সমাজের চিত্র। তবে সাহিত্যে সমাজচিত্র দেয়া মানে যা আছে কেবল তাই চিত্রিত করা নয়– যা হওয়া উচিত তারও সঙ্কেত দেয়া, প্রেরণা দেয়া নইলে রচনা নকশাই রয়ে যায়।[১] তাই সাহিত্য যা আছে শুধু তারই ছবি নয়, যা কাম্য তারও বাস্তব সম্ভাবনার চিত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন, "যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাবনা অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে।"[২] সমগ্র মানুষের ভাব, সমগ্র মানুষের বেদনা উপন্যাসেই বেশি প্রকাশ পায়। উপন্যাস হচ্ছে আধুনিকতম ও সমগ্রতাস্পর্শী সেই শিল্প প্রতিমা, যেখানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় জীবনের আদি-অন্ত; শিল্পীত স্বরগ্রামে উদ্ভাসিত হয়ে লেখকের জীবনার্থ আর তার স্বদেশ-সমাজ-সমকাল। বুর্জোয়া সমাজের শক্তি এবং স্বাতন্ত্র্যে আত্মস্থ হয়ে, মধ্যযুগীয় জীর্ণ সামন্ত সমাজ কাঠামো ভেঙে দেয়ার অভিপ্সা নিয়ে, উপন্যাসের জন্ম। নবোত্থিত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বুর্জোয়া-সেবিত সমাজই উপন্যাসের আদি-জনয়িতা। আধুনিক যুগে সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তি মানুষের যে সংগ্রাম– তারই মহাকাব্যিক রূপ উপন্যাস।[৩]

উপন্যাস হচ্ছে জীবন চেতনার সমীক্ষণ, সমকালের পটভূমিতে জীবনের অনুসন্ধান ও সামাজিক, পারিবারিক জীবনের উপস্থাপন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজকে ভেঙ্গে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে ষোল-সতের শতকে যে নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণী এবং সামাজিক শক্তির জন্ম হল, তখনই সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হল উপন্যাস। অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হয়েছে উপন্যাসের।[৪] শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, ইতিহাসের ঐতিহ্যের স্বাভাবিক পরিক্রমা, কালান্তরের বার্তা, সামন্ত সমাজ অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষা, নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া ও নতুন যুগের আবির্ভাব উপন্যাসের মত করে এত বিস্তৃত পরিসরে সাহিত্যের অন্য কোন শাখায় মূর্ত হয়ে ওঠেনি। সমাজের মহৎ, সুন্দর ও কুৎসিত রূপ অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক জীবনের যে অগ্রসর চেতনার আভাস দেন তা দেশকালাভিমুখী হয়ে ওঠে।[৫]

জীবনের ইতি এবং নেতিকে উপন্যাস সবল বাহুতে ধারণ করে। এর যা কিছু নরক যা কিছু সৌরভ সবই পাঠকের প্রত্যাশা এবং অনুভূতিকে পূরণ করে বলেই উপন্যাস পাঠকের জন্য বিশুদ্ধ নান্দনিকতার পাশাপাশি সামাজিক প্রয়োজন।[৬] এ জন্যই উপন্যাস সামাজিক শিল্প, যে শিল্প ব্যক্তিক অনুভূতির কেন্দ্র অতিক্রম করে মোহনার মতো বহু স্রোত হৃদয়ে ধারণ করে। সমাজ ও সমাজ বিধৃত মানুষ, পট ও পট নির্ভর জীবন উপন্যাসের উপাদান। শুধু অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ দর্শনের সাহায্যে নয়,

Dhaka University Institutional Repository

এই সামগ্রিক বোধ তখনই সৃজিত হতে পারে যখন ঔপন্যাসিকের জীবন অভিজ্ঞতা একটি নৈতিক সচেতনতায় শেষ পর্যন্ত মণ্ডিত হয়ে উঠে।[৭] তাই উপন্যাসে বিস্তৃত জীবন যেমন উপস্থাপিত হয় তেমনি লেখকের জীবন দর্শনও বিদ্যমান থাকে। সে কারণেই উপন্যাসের ব্যক্তি কদাচ একক ব্যক্তি নয়। ব্যক্তি কাহিনীও একক কাহিনী নয়। উপন্যাসে পরস্পর সম্পর্কের টানাপড়েন ব্যক্তির জীবনের শুধু নয়, সমষ্টির মূল্যবোধের নানা দিক এবং তাদের যথার্থতা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। ব্যক্তি জীবনের মুকুরে সমাজ জীবনের মূল্যবোধের যাচাই হয়।[৮] শুধু তাই নয়, সার্থক উপন্যাস যুগ লক্ষণাক্রান্ত হয়। উপন্যাসের কুশীলবরা এই যুগ লক্ষণকে বহন করে। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তায় তার ব্যক্তি জীবনের ন্যায় ক্রম যতটা ক্রিয়াশীল থাকে যুগের সমকালীন টানাপড়েনও ততটা না হোক অন্তত আংশিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই উপন্যাসে ব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিটি যে সমাজের অংশ, সভ্যতার যে পর্যায়ের সে প্রতিনিধি তার বিচিত্র রূপ নানাভাবে উপন্যাসে ছায়াপাত করে। উপন্যাসের বিষয়জ্ঞান তাই প্রকৃতপক্ষে তার সময় জ্ঞান, সমাজ জ্ঞান, ইতিহাস জ্ঞান এবং ব্যক্তি মানসের জ্ঞান এই সমস্তের সারৎ সার।[৯]

'Art for art's sake' উপন্যাসের ক্ষেত্রে কখনই কার্যকরভাবে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব নয়। জীবনের যে বিস্তৃতিকে ধারণ করে উপন্যাসের পথচলা ও জীবনের যে সামগ্রিকতা উপন্যাসের লক্ষ্য সেখানে উপন্যাস নানাভাবে নানা দর্শন, তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক সত্যকে উপস্থাপন করবে এটাই বাস্তবতা।

সাহিত্যে বাস্তব জীবন ও সমাজের প্রতিফলন ঘটে। মেথ্যু আর্নল্ড-এর Literature is the criticism of life- এই উক্তিটি উপন্যাস সম্পর্কেই বেশি প্রযোজ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তিকে তাঁর সাহিত্যাদর্শে একটি মূলনীতি রূপে গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় জীবনের একটি দীর্ঘ সময়কে বঙ্কিম একান্তভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিলেন। উপন্যাসে বঙ্কিমের সেই বলয়েই অবস্থান করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। তবে রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের পরিধিকে অনেক দূর সম্প্রসারিত করেছিলেন।[১০]

কিন্তু সবুজপত্রের যুগে প্রমথ চৌধুরী প্রচার করলেন কলাকৈবল্যবাদ, রসসর্বস্বতা, art for art's sake। উপন্যাসে এই আদর্শকে ধারণ করে একে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করলেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ। কলাকৈবল্যবাদের কালেই নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের মাধ্যমে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পাশাপাশি বিকশিত হচ্ছিল। গণজাগরণের চেতনা দ্বারা তা পরিপূর্ণ ছিল।[১১] জীবনমুখী বা জীবনবাদী সাহিত্য সংস্কৃতি এক সময় প্রাধান্য বিস্তার

Dhaka University Institutional Repository

করল। রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লবের প্রভাবও দেখা গেল সাহিত্যাঙ্গনে, বিশেষতঃ উপন্যাসে। দেশ বিভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গের উপন্যাসের ইতিহাসে দুটো ভিন্ন স্রোত পরিলক্ষিত হয়। সামন্ত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় কিছু উপন্যাস। অন্যটির ভিত্তিভূমিতে ছিল উদার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ। সমাজ পটভূমিতে জীবন ও নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ ঘটে উপন্যাসে। মনোবিশ্লেষণ ও চেতনা প্রবাহ রীতিকে অঙ্গীকার করে উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টাও এ সময় পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাউত্তর কাল নানাভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও গণমানুষের চেতনায় নিয়ে এসেছে কিছু লক্ষণযোগ্য পরিবর্তন। ১৯৭১ সালে নয় মাসের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হলেও এই স্বাধীনতা আন্দোলনের দূরবর্তী কারণ অনেক ছিল। এর মাঝে সর্ববৃহৎ কারণ ছিল ভাষা সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থানের সকল বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনার অভিনবত্বে, দ্বিতীয় বৃহৎ কারণ ছিল ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন নানা ভাষাভাষীদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের উপযোগী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অন্বেষণে পাকিস্তানি নেতৃবর্গের সম্যক ব্যর্থতা। ফলে পাকিস্তানের কাঠামোগত স্ববিরোধিতার সমাধান না ঘটে বরং এক সংঘাতের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে ওঠে। পাকিস্তান গঠনের পর থেকেই বাঙালিরা রাষ্ট্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও শোষিত হতে শুরু করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারা কখনো রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন, কখনো স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, কখনো জনসংখ্যাভিত্তিক আইন পরিষদ গঠনের দাবি এবং কখনো অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের দাবি করে এসেছে। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে পূর্ব বাংলার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ। নানা জোয়ার-ভাটা, ঐক্য ও বিভেদ সত্ত্বেও এই সংগ্রামের ধারা সর্বদা প্রবহমান ছিল।[১২] এরই ধারাবাহিকতায় ঘটেছে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও তাতে ভাঙন, আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধির এক পর্যায়ে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল, পূর্ব বাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রবল জনমত, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মন্দার পটভূমিতে শেখ মুজিবের বিখ্যাত ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা, ১৯৬৮ সালে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী স্বৈরশাসনবিরোধী ব্যাপক গণআন্দোলন ও ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন। কিন্তু এই বিজয় মানা পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর জন্য কঠিন ছিল। যে রাজনৈতিক দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি এই সঙ্কট মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত তা তাদের ছিল না। ফলে নগ্ন সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা সমাধান চাইল। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের বিপর্যয় ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় পরিষদ বৈঠক বাতিলের সাথে সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সারা পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত গণবিস্ফোরণ ঘটে। এই অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানকে একটি অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করতে আওয়ামী লীগ অসামান্য সাফল্য অর্জন করে।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য পাকিস্তানি শাসকদের যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন ছিল তা তাদের ছিল না। তারা এই আন্দোলন প্রতিহত করতে সামরিক হামলার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এই সামরিক হামলার আগ পর্যন্ত স্বাধীনতার স্বপক্ষের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উঠতে পারে নি। ফলে ইয়াহিয়া-মুজিব, মুজিব-ভুট্টো সমঝোতা আলোচনা বিষয়ে যুগপৎ সন্দিহান ও আশাবাদী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আসন্ন সামরিক হামলার বিরুদ্ধে যথোপযোগী সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তিন সপ্তাহকালের অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় এমন এক মৌল রূপান্তর ঘটে যে পাকিস্তানিদের নৃশংস গণহত্যা শুরু হওয়ার সাথে সাথে কোনো রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা না হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই হত্যাকান্ডের কথা সারাদেশে ছড়িয়ে পরলে সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি অংশ আত্মরক্ষা ও দেশাত্মবোধের মিলিত তাগিদে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কারো আহ্বান ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই বিদ্রোহ শুরু করে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নানা দ্বন্দ্ব ও টানাপড়েন সত্ত্বেও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম সফল মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। নয় মাসের যুদ্ধের ফলে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। এই যুদ্ধ দেশবাসীর মনোজগতে আনে বিরাট পরিবর্তন, তৈরি করে নতুন প্রত্যাশা, মূল্যবোধ। যে সততা, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতার দ্বারা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে কাজ লাগিয়ে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে গড়ে তোলা যেত, দেশবাসীর অথনৈতিক মুক্তির লড়াইকে সাফল্যমণ্ডিত করা যেত সে রকম কোন দক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হোন আমাদের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। বরং তারা দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। ফলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে যে বিপুল উদ্দীপনায় দেশ গঠনের কাজ শুরু করা যেত তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। জনগণের বিরাট আশা ও স্বপ্ন হতাশায় রূপান্তরিত হলো।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বপ্ন ভঙ্গ, হতাশা, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি থেকে জনকল্যাণ বিসর্জন, 'উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কহীন লুটতরাজের মাধ্যমে ধনিক শাসকশ্রেণীর উদ্ভব'[১৩] সামাজিক জীবনে আনে

Dhaka University Institutional Repository

অধোগতি। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ সামগ্রিকভাবে উপন্যাসচর্চায় যেটুকু সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তা মূল্যায়নের দাবি রাখে।[১৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে যে সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটেছে তাতে মানুষের মেজাজের পরিবর্তন, ব্যক্তির আত্মন্বেষণ ও আত্মানুসন্ধানের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, সংশয় ও নৈরাজ্য, যে দ্বিধা ও দোটানা, যে আত্মপ্রতারণা ও পরস্পর বিরোধিতা, এস্টাবলিশমেন্টের প্রতি আনুগত্য ও তার সঙ্গে ভীরু আপোশ, নিঃসঙ্গতার বেদনা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের সূচীমুখ তীক্ষ্ণতা, এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে তারুণ্যের বিদ্রোহ, হঠকারিতা ও সাহসী সংগ্রাম, নতুন পৃথিবী অন্বেষণের তীব্র ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে ফিরে পাওয়ার ও অর্জনের তীব্র বাসনা– এসব কিছুই আমাদেরকে চঞ্চল, উত্তেজিত ও অশান্ত করে তুলেছে। ২৭ বছরের (১৯৭২-৯৮) বাংলাদেশের উপন্যাসে এই সব প্রগতি ও পশ্চাৎগতির ছাপ পড়েছে। পাশাপাশি ব্যক্ত হয়েছে প্রাচীনপন্থী ধারণা ও আধুনিক মানসিকতা।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আত্মজিজ্ঞাসা, মুক্তিযুদ্ধকালীন আত্মোৎসর্গ ও প্রতিরোধ, স্বাধীন বাংলাদেশে নৈতিক বিবেচনারহিত অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জনের নেশায় উন্মত্ত নাগরিক, পশ্চাৎমুখী ধর্মান্ধতা ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী তরুণ, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর লাঞ্ছনা এসব বিষয় বারে বারে বাংলাদেশের উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসেও এই বিষয়গুলো এসেছে নানাভাবে নানা পটভূমিতে। এর পাশাপাশি তাঁদের রচনায় ইতিহাস, সমাজ, পরিবার, প্রেম, নারীর একান্ত নিজস্ব বেদনা, নারীবাদী চেতনার উপস্থাপন ঘটেছে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসের একটি তালিকা নীচে প্রদান করা হলো।

জোবেদ খানম (জন্ম - ১৯২০)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. অভিশপ্ত প্রেম (১৯৫৯), ২. দুটি আঁখি দুটি তারা (১৯৬২), ৩. বন মর্মর (১৯৬২), ৪. অনন্ত পিপাসা (১৯৬৭), ৫. গল্প বলি শোন (১৯৭৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সামস্ রশীদ (জন্ম - ১৯২০)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. উপল উপকূলে (১৯৬৯), ২. নীলাঞ্জনা (১৯৭১), ৩. প্রাণ বসন্ত (১৯৭১), ৪. হৃদয় উপবনে (১৯৭৪), ৫. পঞ্চালিকা (১৯৭৬), ৬. সিন্ধু বারোয়াঁ (১৯৭৭), ৭. মন কোরক (১৯৮১), ৮. মন প্রসূন (১৯৮২), ৯. ক্যামেলিয়া মিনেনশিস (১৯৮৫), ১০. পর্বত বুরুঞ্জী (১৯৮৫), ১১. প্রীতমপুর (১৯৯০)।

নীলিমা ইব্রাহিম (জন্ম - ১৯২১)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮), ২. এক পথ দুই বাঁক (১৯৫৮), ৩. পথশ্রান্ত (১৯৫৮), ৪. কেয়াবন সঞ্চারিণী (১৯৬২), ৫. বহ্নি বলয় (১৯৮৫)।

সেলিমা রাহমান (জন্ম - ১৯২৪)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. দুরন্ত পাড়ি (১৯৭৫), ২. মরীচিকা বৃত্তে (১৯৮৫), ৩. মল্লিকা বনে যখন (১৯৮৬)।

সৈয়দা লুৎফুন্নেসা (জন্ম - ১৯২৪)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. রাজ নন্দিনী (১৯৭১)।

রাজিয়া মাহবুব (জন্ম - ১৯২৮)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. বন্ধন (১৯৬০)।

মালিহা খাতুন (জন্ম - ১৯২৮)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. এক তুলি কত রং (১৯৬৪), ২. এই আঁধারে এই আলোতে (১৯৯৩), ৩. নীল কষ্টের ইতিকথা (১৯৯৫)।

হেলেনা খান (জন্ম - ১৯২৯)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. উত্তুরে বাতাস (১৯৭০), ২. নীল পাহাড়ের হাতছানি (১৯৮৮), ৩. আত্মজ ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৯৬), ৪. দুই ধার পৃথিবী (১৯৯৭)।

Dhaka University Institutional Repository

জাহানারা ইমাম (জন্ম - ১৯২৯)

প্রকাশিত উপন্যাসঃ ১. অন্য জীবন (১৯৮৫), ২. নিঃসঙ্গ পাইন (১৯৯০), ৩. নয় এ মধুর খেলা (১৯৯০), ৪. দুই মেরু (১৯৯০), ৫. নাটকের আসনে (১৯৯০)।

রাজিয়া মজিদ (জন্ম - ১৯৩০)

প্রকাশিত উপন্যাসঃ ১. তমসা বলয় (১৯৬৬), ২. দিগন্তের স্বপ্ন (১৯৬৭), ৩. নক্ষত্রের পতন (১৯৯২), ৪. সেই তুমি (১৯৮৪), ৫. অশঙ্কিনী সুদর্শনা (১৯৮৪), ৬. দিনের আলো রাতের আঁধার (১৯৮৪), ৭. মেঘের জলতরঙ্গ (১৯৮১), ৮. এই মাটি এই প্রেম (১৯৮৫), ৯. দাঁড়িয়ে আছে একা (১৯৮৭), ১০. অরণ্যে জনতা (১৯৮৭), ১১. শতাব্দীর সূর্যশিখা (১৯৮৭), ১২. সুন্দরতম (১৯৮৭), ১৩. জ্যোৎস্নায় শূন্য মাঠ (১৯৯৪)।

রাবেয়া খাতুন (জন্ম - ১৯৩৫)

প্রকাশিত উপন্যাসঃ ১. মধুমতি (১৯৬৩), ২. মন এক শ্বেত কপোতী (১৯৬৫), ৩. সাহেব বাজার (১৯৬৯), ৪. অনন্ত অন্বেষা (১৯৬৯), ৫. শালমারবাগ রাজারবাগ (১৯৬৯), ৬. ফেব্রারি সূর্য (১৯৭৫), ৭. অনেক জনের একজন (১৯৭৬), ৮. জীবনের আরেক নাম (১৯৭৬), ৯. দিবস রজনী (১৯৮০), ১০. সেই এক বসন্তে (১৯৮৬), ১১. মোহর আলী (১৯৮৫), ১২. নীল নিশীথ (১৯৮৩), ১৩. বায়ান্ন গলির এক গলি (১৯৮৪), ১৪. পাখি সব করে রব (১৯৮৭), ১৫. নয়না লেকে রূপবান দুপুর (১৯৮৭), ১৬. মিড সামার (১৯৮৮), ১৭. ই বাদর মাহ ভাদর (১৯৮৮), ১৮. সে এবং যাবতীয় (১৯৮৯), ১৯. হানিফের ঘোড়া (১৯৯৫), ২০. হিরণ দাহ (১৯৯৫), ২১. এই বিরহকাল (১৯৯৫), ২২. হোটেল গ্রীন বাটন (১৯৯৫), ২৩. চাঁদের ফোঁটা (১৯৯৬), ২৪. বাগানের নাম মালনী ছড়া (১৯৯৫), ২৫. প্রিয় গুলশানা (১৯৯৭)।

রাজিয়া খান (জন্ম - ১৯৩৬)

প্রকাশিত উপন্যাসঃ ১. বটতলার উপন্যাস (১৯৫৮), ২. অনুকল্প (১৯৫৯), ৩. প্রতিচিত্র (১৯৭৬), ৪. বন্দী বিহঙ্গ (১৯৭৬), ৫. সোনালী ঘাসের দেশে (১৯৭৮), ৬. ধ্রুপদী (১৯৮১), ৭. চিত্রকাব্য (১৯৮২), ৮. হে মহাজীবন (১৯৮৩)।

Dhaka University Institutional Repository

দিলারা হাশেম (জন্ম - ১৯৩৬)

১. ঘর মন জানালা (১৯৬৫), ২. হলদে পাখির কান্না, ৩. একদা এবং অনন্ত (১৯৭৫), ৪. আমলকীর মৌ (১৯৭৮), ৫. স্তব্ধতার কানে কানে (১৯৭৭), ৬. নায়ক, ৭. বাদামী বিকেলের গল্প (১৯৮৩), ৬. কাকতালীয় (১৯৮৫) ৭. শঙ্খকরাত (১৯৯৫), ৮. অনুক্ত পদাবলী (১৯৯৮) ।

বেগম জাহান আরা (জন্ম - ১৯৩৭)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. অয়নাংশ (১৯৮৭) ।

বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ (জন্ম - ১৯৩৮)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. প্রত্যাবর্তন (১৯৬০), ২. কাজল দিঘির উপকথা (১৯৬২), ৩. নূপুর নিক্কন (১৯৬৯), ৪. আজকের পৃথিবী (১৯৭০), ৫. সমুদ্রের ঢেউ (১৯৭৬), ৬. বন চন্দ্রিকা (১৯৭৩), ৭. নিরুত্তর (১৯৭৪) ।

মকবুলা মঞ্জুর (জন্ম - ১৯৩৮)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. আর এক জীবন (১৯৬৮), ২. জল রং ছবি (১৯৮০), ৩. অবসন্ন গান (১৯৮২), ৪. বৈশাখের শীর্ণ নদী (১৯৮৩), ৫. আত্মজ ও আমরা (১৯৮৮), ৬. পতিত পৃথিবী (১৯৮৯), ৭. প্রেম এক সোনালী নদী (১৯৮৯), ৮. শিখরে নিয়ত সূর্য (১৯৮৯), ৯. অচেনা নক্ষত্র (১৯৯০), ১০. কনে দেখা আলো (১৯৯০) ।

রিজিয়া রহমান (জন্ম - ১৯৩৯)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. ঘর ভাঙ্গা ঘর (১৯৭৪), ২. উত্তর পুরুষ (১৯৭৭), ৩. রক্তের অক্ষর (১৯৭৮), ৪. বং থেকে বাংলা (১৯৭৮), ৫. অলিখিত উপাখ্যান (১৯৮০), ৬. অরণ্যের কাছে (১৯৮০), ৭. শিলায় শিলায় আগুন (১৯৮০), ৮. সূর্য সবুজ রক্ত (১৯৮১), ৯. ধবল জ্যোৎস্না (১৯৮০), ১০. সবুজ পাহাড় (১৯৮৫), ১১. প্রেম আমার প্রেম (১৯৮৫), ১২. ঝড়ের মুখোমুখি (১৯৮৬), ১৩. একটি ফুলের জন্য (১৯৮৬), ১৪. একটি ফুলের জন্য (১৯৮৬), ১৫. শুধু তোমার জন্য (১৯৮৮), ১৬. হে মানব-মানবী (১৯৮৯), ১৭. হারুন ফেরেনি (১৯৯৪) ।

Dhaka University Institutional Repository

খালেদা এদিব চৌধুরী (জন্ম - ১৯৩৯)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. অনন্ত মধ্যাহ্নরাত (১৯৮০)।

আনোয়ারা সৈয়দ হক (জন্ম - ১৯৪০)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. তৃষিতা (১৯৮৬), ২. সোনার হরিণ (১৯৮৭), ৩. স্বামী স্ত্রী ও অন্য একজন (১৯৯১)।

নয়ন রহমান (জন্ম - ১৯৪০)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. অন্য রকম যুদ্ধ (১৯৮০), ২. সূর্য করতলে (১৯৯৪), ৩. জীবনের কাছে ফেরা (১৯৯৭)।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী (জন্ম - ১৯৪০)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. সামনে সময় (১৯৮১), ২. ঘরের ছায়া (১৯৮৪)।

জুবাইদা গুলশান আরা (জন্ম - ১৯৪২)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. ধলপহরের আলো (১৯৮২), ২. বিষাদ নগরের যাত্রা (১৯৮২), ৩. দেওদানবের মালিকানা (১৯৮৫), ৪. প্রমিথিউসের আগুন (১৯৮৫), ৫. ছোঁবুড়ির দৌড় (১৯৮৭), ৬. ঘৃণার জঠরে জন্ম (১৯৮৮), ৭. অশ্রু নদীর ওপারে (১৯৮৯), ৮. ঊষারাগ (১৯৯০), ৯. ঘাসের উপর মুখ রেখে (১৯৯১), ১০. অবিনাশী জলধারা (১৯৯১), ১১. দুঃখের হাত ধরে (১৯৯১)।

হাজেরা নজরুল (জন্ম - ১৯৪২)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. উপক্রমণিকা (১৯৮৬), ২. শরবিদ্ধ শিশির (১৯৯০), ৩. অমিত্রাক্ষর ছন্দ (১৯৯০), ৪. চেনা সাগরের অচেনা ঢেউ (১৯৯১), ৫.পাখির নীড় (১৯৯২)।

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ (জন্ম - ১৯৪৫)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. সারেংগীওয়ালা (১৯৭৫), ২. বন্দীদিন বন্দীরাত্রি (১৯৭৬)।

Dhaka University Institutional Repository

লায়লা রশীদ (জন্ম - ১৯৪৬)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. আদিম স্বপ্নে বসতি (১৯৮৮)।

সেলিনা হোসেন (জন্ম - ১৯৪৭)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২), ২. হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), ৩. মগ্ন চৈতন্যে শিস (১৯৭৯), ৪. যাপিত জীবন (১৯৮১), ৫. নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩), ৬. পদ শব্দ (১৯৮৩), ৭. চাঁদবেনে (১৯৮৪), ৮. পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬), ৯. নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি (১৯৮৭), ১০. ক্ষরণ (১৯৮৮), ১১. কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯), ১২. খুন ও ভালবাসা (১৯৯০), ১৩. কালকেতু ও ফুল্লরা (১৯৯২), ১৪. ভালবাসা প্রীতিলতা (১৯৯২), ১৫. টানাপড়েন (১৯৯৪), ১৬. গায়ত্রী সন্ধ্যা (১ম, ১৯৯৪, ২য় ১৯৯৫, ৩য় ১৯৯৬), ১৭. দীপান্বিতা (১৯৮৭), ১৮. যুদ্ধ (১৯৯৮)।

অনামিকা হক লিলি (জন্ম - ১৯৪৮)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. অনুক্ষণ (১৯৮৫), ২. ছায়ার আচ্ছাদন (১৯৮৯), ৩. অগ্নি ও জলের ভিতর (১৯৯০)।

নূর হাসনা লতিফ (জন্ম - ১৯৪৯)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. জুঁই ফুলের শুভ্রতা (১৯৮৮), ২. মুক্ত অভ্র (১৯৮৯), ৩. এক দিগন্তে দৃষ্টি (১৯৮৯), ৪. আধি (১৯৯৫)।

দিলারা মেজবাহ (জন্ম - ১৯৫০)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. স্বপ্ন লোকের চাবি (১৯৯১), ২. নাগরদোলার দিন (১৯৯৬)।

পান্না কায়সার (জন্ম - ১৯৫০)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. মুক্তি (১৯৯২), ২. নীলিমায় নীল (১৯৯২), ৩. হৃদয়ে বাংলাদেশ (১৯৯৩), ৪. সূর্য সাক্ষী (১৯৯৩), ৫. শেষ বিকেলের বৃষ্টি (১৯৯৩), ৬. মানুষ (১৯৯৪), ৭. অন্য কোনখানে (১৯৯৪), ৮. তুমি কি কেবলি ছবি (১৯৯৪), ৯. রাসেলের যুদ্ধ যাত্রা (১৯৯৪), ১০. দাঁড়িয়ে আছ

Dhaka University Institutional Repository

গানের ওপারে (১৯৯৪), ১১. আমি (১৯৯৪), ১২. না পান্না না চুনি (১৯৯৫), ১৩. অন্য রকম ভালবাসা (১৯৯৫), ১৪. সুখ (১৯৯৫)।

সুলতানা রিজিয়া (জন্ম - ১৯৫০)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. ভালবাসার মৌলি (১৯৮৮)।

নাজমা তাশমীন (জন্ম - ১৯৫১)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. তোমার জন্য (১৯৮৮), ২. সেদিন দুজনে (১৯৮৯), ৩. ফেরারী চন্দ্রিমায় (১৯৮৯), ৪. আসে বসন্ত ফুলবনে (১৯৮৯), ৫. তারায় তারায় খচিত (১৯৯০)।

মারুফী খান (জন্ম - ১৯৫৪)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. ধাত্রী (১৯৯২)।

সাঈদা জামান (জন্ম - ১৯৫৭)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. বাতাসের বোবা কান্না (১৯৯০)।

তসলিমা নাসরীন (জন্ম - ১৯৬২)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. অপর পক্ষ (১৯৯২), ২. শোধ (১৯৯২), ৩. ভ্রমর কইও গিয়া (১৯৯৩), ৪. লজ্জা (১৯৯৩)।

নাসরিন জাহান (জন্ম - ১৯৬৪)

প্রকাশিত উপন্যাস: ১. উড়ুক্কু (১৯৯৩), ২. চন্দ্রের প্রথম কলা (১৯৯৪), ৩. যখন চারপাশের বাতিগুলো নিভে আসে (১৯৯৫), ৪. চন্দ্রলেখার যাদু বিস্তার (১৯৯৫), ৫. সোনালী মুখোশ (১৯৯৬), ৬. বিদেহী (১৯৯৭), ৭. লি (১৯৯৭), ৮. ক্রুশকাঠে কন্যা (১৯৯৮)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ হতে ১৯৯৮ সময়কালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ জন মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাস এই গবেষণা কর্মে আলোচিত হয়েছে। এই পাঁচ জন মহিলা ঔপন্যাসিকের পরিচিতি নীচে সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হলো।

দিলারা হাশেম

দিলারা হাশেম বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র নাম। মধ্যবিত্ত নারীর স্বাধীন জীবনান্বেষণের প্রচেষ্টা দিলারা হাশেমের উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে দৃঢ়তার সাথে। ১৯৩৬ সালের ২৫ শে আগষ্ট দিলারা হাশেম যশোরে জন্মগ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন তিনি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘর মন জানালা' স্বাধীনতাপূর্বকালে ১৯৬৫ সালে রচিত হলেও এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় এটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর যে সব উপন্যাস এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হলো,

১। ঘর মন জানালা (১৯৬৫)

২। একদা এবং অনন্ত (১৯৭৫)

৩। আমলকীর মৌ (১৯৭৮)

রাবেয়া খাতুন

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে রাবেয়া খাতুন এক বিশিষ্ট নাম। তিনি একদিকে যেমন ইতিহাসের বিরাট প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসে শৈল্পিক দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন, অন্যদিকে তেমন একান্ত ব্যক্তিগত দৈন্য, বেদনা, দুঃখও তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে আন্তরিকতার স্পর্শে। যৌনতা নিয়েও তিনি সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী সাহসের সাথে তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর যে সব উপন্যাস এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হলো,

১। বায়ান্ন গলির এক গলি (১৯৮৪)

২। এই বিরহকাল (১৯৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

রিজিয়া রহমান

১৯৩৯ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে, কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন রিজিয়া রহমান। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুটি বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুরতা নৃশংসতা, ১৯৩০ এর দশকের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানুষের বিচারবুদ্ধি, মনন শক্তি ও চিন্তার জগতকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষেও এর ঢেউ লাগে। নানা দর্শন, তত্ত্ব, ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ চেতনার জগতে আনে ব্যাপক প্রবহমানতা। পরিবর্তিত এই নব জীবনবোধ ও জীবনজিজ্ঞাসায় বেড়ে উঠেছেন রিজিয়া রহমান। যার সব কিছুরই প্রভাব তাঁর উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। বিষয় বৈচিত্র্য, ইতিহাস জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা ও শৈল্পিক উৎকর্ষে তাঁর উপন্যাস স্বাধীনতাউত্তর কথাসাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা।[১৫]

তাঁর যে সব উপন্যাস এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হলো,

১। ঘর ভাঙ্গা ঘর (১৯৭৪)

২। রক্তের অক্ষর (১৯৭৮)

৩। বং থেকে বাংলা (১৯৭৮)

৪। সূর্য সবুজ রক্ত (১৯৮১)

৫। একাল চিরকাল (১৯৮৪)

সেলিনা হোসেন

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের এক উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক। দেশ বিভাগের বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন তাঁর জন্ম। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে যে কজন মহিলা ঔপন্যাসিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন তাদের মধ্যে সেলিনা হোসেন অন্যতম। ভাষা আন্দোলন, সমকালীন সমাজ বাস্তবতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনা, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর জীবন বাস্তবতা, সাঁওতাল জীবন, ধীবর জীবন, চাষী ও শ্রমিকের জীবন, রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত পরিসরে সেলিনা হোসেনের

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। বিষয় গৌরবে সেলিনা হোসেনের প্রতিটি উপন্যাসই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী।

তাঁর যে সব উপন্যাস এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হলো,

১। যাপিত জীবন (১৯৮১)

২। চাঁদ বেনে (১৯৮৪)

৩। পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬)

৪। নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি (১৯৮৭)

নাসরিন জাহান

১৯৬০ এর দশকের প্রথমার্ধে যখন পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের শাসন শোষণ, নির্যাতন ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে উঠছে, প্রবল তারুণ্যের উচ্চারণে টালমাটাল স্বদেশ, সে রকম এক সময়ে ১৯৬৪ সালের ৫ই মার্চ কঠিন রূঢ়তায় বাস্তব জীবনের রূপকার কথাশিল্পী নাসরিন জাহানের জন্ম। জীবনের দৈন্য, ক্লেদ, গ্লানি, কষ্ট, বেদনাক্লিষ্ট কিন্তু স্বাপ্নিক মানুষকে অদ্ভুতভাবে ধারণ করতে, ক্লেদ ও গ্লানিকে কঠিন বাস্তবতায় রূপায়িত করতে মেদহীন ঋজু ভাষা নির্মাণ করেছেন নাসরিন জাহান। প্রচলিত নীতি নৈতিকতার, সামাজিক ধ্যান-ধারনার কঠিন রজ্জুতে মানুষের জীবনীরস ও বাঁচার সংগ্রাম কি করে রসহীন ক্লেদাক্ত হয়ে উঠে নাসরিন জাহানের উপন্যাস তারই বয়ানভাষ্য।

তাঁর যে সব উপন্যাস এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হলো,

১। উড়ুক্কু (১৯৯৩)

২। ক্রুশকাঠে কন্যা (১৯৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। আহমেদ শরীফ, *সংস্কৃতি ভাবনা* (উত্তরণ, ঢাকা; ২০০৪), পৃ. ৭৫

২। রবীন্দ্র সমগ্র, চতুর্থ খন্ড, (পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ; ২০১১), পৃ. ৬২৩

৩। বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯১), পৃ. ১

৪। দেবীপদ ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের কথা* (কলকাতা; ১৯৬১), পৃ. ৬

৫। ফরিদা সুলতানা, *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৯), পৃ. ২

৬। সেলিনা হোসেন, *স্বদেশে পরবাসী* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৩), পৃ. ৩

৭। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (সাহিত্যশ্রী, কলকাতা; ১৯৭১), পৃ. ২২

৮। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

৯। *ঐ*

১০। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সাহিত্য চিন্তা* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৫)

১১। *পূর্বোক্ত*

১২। মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ২০০৪), পৃ. ১

১৩। বদরুদ্দীন উমর, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* (সুবর্ণ, ঢাকা; ১৯৯৩)

১৪। মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৮৫)

১৫। বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯১), পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনা (১৯৭২-১৯৮০)

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এ দশকের মহত্তম প্রাপ্তি। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা গ্রাম শহরের জীবনকে করল তরঙ্গিত আলোড়িত। স্বাধীনতা পরবর্তী অর্থশক্তি ও পেশীশক্তির আধিপত্য মানুষের নীতি ও মূল্যবোধকে করল বিপর্যস্ত। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নভঙ্গজাত বেদনায় মানুষ অনুভব করলো হতাশা ও নৈরাশ্য। ঢাকা স্বাধীন দেশের রাজধানী হওয়ায় ভাগ্যান্বেষী ও জীবিকাসন্ধানী মানুষের স্রোত হলো ঢাকামুখী।

এই সময়ের উপন্যাসে যুদ্ধের আশা, স্বপ্ন, বেদনা, কষ্টের চিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে তেমনি রচিত হয়েছে জিজ্ঞাসায়, বেদনায়, হতাশায়, ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত জীবনের অনুভূতি এবং প্রতিকূল সমাজ কাঠামোতে মানুষের প্রতিবাদ, দ্রোহ, সংগ্রাম এবং গ্রাম শহরের জীবনবাস্তবতা।

এ সময়ে রচিত মহিলা ঔপন্যাসিকদের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো- দিলারা হাশেমের একদা এবং অনন্ত (১৯৭৫), আমলকীর মৌ (১৯৭৮), স্তব্ধতার কানে কানে (১৯৭৭); সেলিনা হোসেনের হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬); রাবেয়া খাতুনের ফেরারী সূর্য (১৯৭৪); রিজিয়া রহমানের ঘর ভাঙ্গা ঘর (১৯৭৪), রক্তের অক্ষর (১৯৭৮), বং থেকে বাংলা (১৯৭৮); রাজিয়া খানের প্রতিচিত্র (১৯৭৬)।

দিলারা হাশেম

ঘর মন জানালা

দিলারা হাশেমের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'ঘর মন জানালা' (১৯৬৫)। উপন্যাসের ঘটনা সামান্য কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মদ্বন্দ্ব, জীবনজিজ্ঞাসা প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষার সাবলীলতা ও ঋজুতায় দিলারা হাশেমের উপন্যাসের বিষয়বস্তু দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে।

'ঘর মন জানালা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নাজমা। বাবা অবসরপ্রাপ্ত রেলের কর্মচারী। বাবা, মা, তিন বোনের সংসারে আর্থিক দৈন্যের কারণে স্কুল ফাইনাল পাশ করেই একটি দোকানের সেলস গার্ল-এর চাকরি নিতে হয় তাকে। বাবার পেনশন আর নাজমার বেতনেই কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে তাদের সংসার। পাশের বাসায় বসবাসকারী মালেক তাদের সকল ভালমন্দের অংশীদার। নাজমার মা অপছন্দ সত্ত্বেও মালেককে উপেক্ষা করতে পারেন না। মালেক একটি ফার্মে ছবি আঁকার

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করে। অনেকদিন পাশাপাশি বাড়ীতে থাকায় এবং কিছুদিন দুজন একই ফার্মে চাকরি করেছিল বলে নাজমা ও মালেক প্রতিদিন একসঙ্গেই কাজে বের হয়। এর মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ধনী ব্যবসায়ী জব্বার সাহেবের পরামর্শে ও সহযোগিতায় নাজমা টাইপিং ও শর্টহ্যান্ড শিখে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে একটু বেশী বেতনে চাকরি পেয়ে যায়। ফার্মের চাকরির অবসরে মালেকও অন্যান্য অর্ডারের ছবি আঁকে, অতিরিক্ত দু'পয়সা আয় করে।

সমসাময়িক নগর জীবনকে চরম অর্থনৈতিক দৈন্য যেভাবে পিষ্ট করছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে নাজমা ও মালেকের জীবনের মধ্য দিয়ে। একদিকে বাবা মা ছোট দুটো বোনকে নিয়ে যে সংসার, তার দায়িত্ব, অন্য দিকে মালেককে নিয়ে মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নাজমার স্বপ্ন। এই দুইকে মেলাতে গিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়েছে তার অন্তর। মালেকের উপর নির্ভর করতে গিয়েও ঠিক ভরসা পায় নি সে। তার চাকরির কারণে পারিবারিক দুরাবস্থা লাঘব হলেও চাকুরী স্থলে নাজমাকে অন্য অনেক চাকুরীজীবী মেয়ের মতোই পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি, কুৎসিত ইঙ্গিত, কদর্য প্রেম নিবেদন ইত্যাদি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। তার ছোট বোন আসমা স্কুল ফাইনাল দেবে। বান্ধবীর কাছ থেকে গল্পের বই এনে পড়ে সে। এভাবে বই আনা নেয়ার ফাঁকে পেয়ে যায় তাকে উদ্দেশ্য করে লিখা বান্ধবীর ভাই আখতারের একটি চিঠি। তার কিশোরী মন এতেই আপ্লুত হয়ে উঠে। তাই আখতার একদিন তাকে তাদের ঘরে একা আহ্বান করলে ফেরাতে পারে নি সে। স্কুল ফাইনালের আগেই তার শরীরে মাতৃত্বের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। কুমারী মাকে সমাজে কি ভয়ানক জীবনবাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয় তা উপলব্ধি করেই মাতৃত্বের শারীরিক লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করতেই রাতের বেলা পুকুরে আত্মহত্যা করতে যায় আসমা। এ সময় বড় বোন নাজমাই তাকে উদ্ধার করে। আর আখতার কিছু না বলে চলে যায় বিদেশে। এ সমাজে লম্পট পুরুষেরা কত সহজে পার পেয়ে যায়, আখতার যেন তাদেরই প্রতিনিধি।

নাজমা তার আবাল্যের প্রেমিক মালেকের কাছে যায় আসমাকে বিয়ে করার অনুরোধ নিয়ে। মালেক সত্যনিষ্ঠ ও প্রেমে একনিষ্ঠ হলেও দুর্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। সে কারণে আসমাকে বিয়ে করার অনুরোধে প্রথমে রেগে গিয়ে নাজমাকে চড় মারলেও শেষ পর্যন্ত আসমাকে বিয়ে করতে সম্মত হয় সে। যদিও এভাবে নিজেকে সমর্পণ করাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবালুতার প্রকাশই ঘটেছে, দুর্বল হয়েছে তার চরিত্র তবু নীতির বোধে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মালেক। কিন্তু বিয়ের রাতেই আসমার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে আকস্মিক নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত জগৎ থেকে পালিয়ে চাকমা যুবতী তুঙ্গার আশ্রয় নেয় শিল্পী মালেক। আপন মনে ছবি এঁকে চলে সে। কিন্তু সেখানেও স্থির হতে পারে না সে, তুঙ্গার বন্য ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ার আগেই সে আবারো পালায়।

বোনের প্রতি কর্তব্য, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে নাজমা মালেক-আসমার বিয়ের ব্যবস্থা করলেও অন্তরের দিক থেকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। মালেকের স্মৃতিকে ভুলতে গিয়ে সে নিজের অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন করে তোলে। দয়া আর কৃতজ্ঞতার বশে জব্বার সাহেব যখন স্ত্রী নিশাতের সাথে বিচ্ছেদের পরে নাজমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, সে তাতে সম্মতি দেয়। তাহলেও, নিশ্চিন্ত কিন্তু প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের ভাবনা তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

> অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পার হয়ে এক বিরাট মহীরূহের আশ্রয় পেল যেন নাজমা। ডিভানটার ওপর কুশনে মুখ গুঁজে এলিয়ে পড়তে পড়তে তিন চার দিনের কবর দেওয়া অবসাদ যেন জীবন্ত সরীসৃপের মত ছড়িয়ে পড়ল তার দেহের কোষে কোষে। বুকের ভেতরের দগ্ধ কঠিন পাথরটা ফেটে একটু একটু করে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল উচ্ছল নির্ঝরিনী। উপুড় হয়ে কুশনটায় মুখ চাপা দিয়ে প্রবল কান্নার আক্ষেপে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল দেহ। স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে সেই ভার নামানো কান্নার কাছে আত্মসমর্পণ করল নাজমা।[১]

মালেকের চিত্রশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভের খবর পত্রিকা মারফত পেয়ে এবং মালেকের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, জব্বার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ বিয়েতে সম্মত হওয়া, আসমার ভবিষ্যত চিন্তা– এই সব টানাপড়েনে এক সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে।

জব্বার সাহেবও মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন নাজমা তাকে ভালবাসে না, কৈশোরের প্রেমকে আজও বুকে আগলে আছে নাজমা। আর অনেক ঐশ্বর্য আর সম্পদের মালিক হয়েও এক অতলান্তিক নিঃসঙ্গতায় ভোগেন জব্বার সাহেব। এক সময় দেশ ছেড়ে চলে যান তিনি।

ছেলে রাতুল যখন দু' বছরের দুরন্ত শিশু, ধরা পড়ে আসমা লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত। মালেক ফিরে আসে অসুস্থ আসমার রোগশয্যা পাশে। মালেকের উদারতা আসমাকে তার প্রতি দুর্বল করে তোলে। এ সময় আসমা তীব্রভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু হয় তার।

Dhaka University Institutional Repository

'ঘর মন জানালা' উপন্যাসের কাহিনী আটপৌঢ়ে। ভাব ভাষার সমন্বয়ও অনেক জায়গায় বিঘ্নিত হয়েছে, কিন্তু দ্বিধা দ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন নাজমা চরিত্রটি নির্মাণে দিলারা হাশেম দক্ষতা দেখিয়েছেন। মালেকের গভীর ভালবাসাও নাজমার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কাছে ম্লান হয়ে যায়। অথচ নাজমা মালেককে ভালবেসেছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে, আশায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। মালেকের ভালবাসাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করে অব্যক্ত বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছে নাজমা। জব্বার সাহেবের সাথে তার সম্পর্ক যেন স্বতন্ত্র আলোক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

যৌবনের উষালগ্নেই প্রেমে প্রতারণার শিকার হয়েছে আসমা। মালেক তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বিয়ে করায় মালেকের প্রতি সে অনুভব করে অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ সে-ও। প্রতারক আখতারের প্রতি বিদ্বেষে সে ছেলে রাতুলকে মারে, কিন্তু ভুলতে পারে না প্রথম প্রেম আখতারকে।

পিতৃহীন সংসারে মালেকই অভিভাবক। নিম্নবিত্ত পরিবারের আরো দশজনের মত সেও জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। প্রেম ও নৈতিকতার দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয় মালেকের অন্তর। শেষ পর্যন্ত প্রেমিকার ইচ্ছার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে।

স্ত্রী নিশাত একমাত্র সন্তানসহ তাকে পরিত্যাগ করলে এক নিঃসীম হতাশায় নিমজ্জিত হোন ব্যবসায়ী জব্বার সাহেব। তাঁর ভাষ্য,

> সুখ কাকে বলে, আমি তাই জানিনে।[২]

নাজমাকে আকড়ে ধরে জীবনপথে ফিরে আসতে চাইলেও তিনি এক সময় উপলব্ধি করেন নাজমা তাকে ভালবাসে না, উল্টো ঘৃণাই করে। বিবেক ও মনুষ্যত্বের দ্বন্দ্বে পর্যুদস্ত জব্বার সাহেব শেষ পর্যন্ত পাড়ি জমান বিদেশে।

এদিকে আসমার ছেলে রাতুলকে কোলে তুলে নেয় মালেক, প্রতীক্ষায় থাকে–

> ফসল কাটার গান, রিক্ত মাটির কান্না।
>
> রুক্ষ, অসমতল ফসলের মাঠ আবার কখন পলিমাটির স্পর্শে সজীব হবে– শুধু তারই বেদনাতুর প্রতীক্ষা।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

এক বেদনা বিধূর দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর নাজমা মালেকের মিলনের আভাস উপন্যাসের শেষে পাওয়া গেলেও মিলন দৃশ্য অঙ্কন করেন নি দিলারা হাশেম। নাজমার সুস্থ হওয়া না হওয়ার দ্বিধা দ্বন্দ্বে পাঠককে রেখে উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন তিনি। নাজমা-মালেকের মধ্য দিয়ে দুঃখ দারিদ্র্যকে অতিক্রম করে জীবনের এক গভীর উপলব্ধিকেই যেন রূপায়িত করেছেন দিলারা হাশেম তার 'ঘর মন জানালা' উপন্যাসে।

একদা এবং অনন্ত

দিলারা হাশেমের 'একদা এবং অনন্ত' উপন্যাসটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত। এই উপন্যাসের জন্যই তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। 'একদা এবং অনন্ত' উপন্যাসের কাহিনী এক দিনের। কিন্তু এই এক দিনের কাহিনীর মধ্যেই দিলারা হাশেম আনতে চেয়েছেন অনন্তের বিস্তার। সুর্মা, তার ভাই বিলু, তাদের মা ও বাবা, নানা, সুর্মার বন্ধু জাহেদ, মাখন, লায়লা, ববিদের জীবন অঙ্কনের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, দুর্ভিক্ষ, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের জীবনের সংকট, এর বিপরীতে লুণ্ঠন ও অন্যায় অনিয়মের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নতুন বিত্তবান শ্রেণীর লাম্পট্য ও ঔদ্ধত্য অত্যন্ত তীক্ষ্মতার সাথে আবির্ভূত হয়েছে 'একদা এবং অনন্ত' উপন্যাসে।

এই অবক্ষয়ের কালেও জাহেদ, সুর্মা ও বিলুরা দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, নতুন প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হবার চেষ্টা করে-

> বাংলাদেশের ভাঙ্গনের পালা একদিন শেষ হতেই হবে। বিলুকে, সুর্মাকে সকলকে তার প্রতিক্ষা করতে হবে। শরীক হতে হবে সেই গড়ায়।[৪]

সুর্মার বাবা সামান্য চাকরী করেন। প্রবল আদর্শনিষ্ঠ একরোখা একজন মানুষ। বাবা মা ছাড়াও তাদের বাড়ীতে আছেন তাদের নানা। মুর্শিদাবাদ ছিল তাঁর আদি নিবাস। অবস্থাপন্ন পরিবার ছিল তাঁর। ১৯৪৭ এর ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাজন তার একেবারেই ভালো লাগেনি। তাই দেশ বিভাগের পরেও তিনি ভারত ছেড়ে পাকিস্তান আসেন নি। পাকিস্তানে তিনি আসেন ১৯৬৩ সালে, এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর। কিন্তু দেশভাগজনিত ক্ষোভ তিনি সারাজীবন লালন করেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

> ঝাঁটার বাড়ি পাকিস্তানের মুখে। না এই পাকিস্তানে আসার জন্যে মুর্শিদাবাদ ছাড়তাম, না আমার ছেলে দুটো যেত।[৫]

তাঁর বড় ছেলে, সুর্মার বড় মামা, ১৯৬৫ এর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে কাশ্মীর সীমান্তে মৃত্যুবরণ করেন। ছোট ছেলে মারা যান একাত্তরে, কুমিল্লায়, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে।

দিলারা হাশেম ইতিহাসের ঘটনাবলী যেভাবে পাল্টে দিয়েছে জীবনকে তারও চিত্র অঙ্কন করেছে উপন্যাসে। দেশ বিভাগ কত মানুষকে যে উন্মুল করেছে সুর্মার নানা তাদেরই একজন। সুর্মার নানার মধ্য দিয়ে দিলারা হাশেম দেশ বিভাগজনিত বেদনা ও দেশ বিভাগের যৌক্তিকতাকেই যেন প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন-

> কি লাভ হয়েছে দু'টুকরো করে? বিশেষ করে বাংলাদেশটাকে? সুভাষ বসু লড়ে নিতেন। তোরা নিয়েছিস ভিক্ষা করে। ভিক্ষের স্বাধীনতার কি দাম আছে?[৬]

সুর্মার নানা এখন একেবারে অথর্ব পঙ্গু, একপাশ অবশ হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের স্মৃতিচারণ করেই কাটে তাঁর অধিকাংশ সময়। নানা এক সময় ক্লাসিক্যাল গান গাইতে পারতেন। বাড়ীতে তানপুরা তবলা ছিল তাঁর, মুর্শিদাবাদে ফেলে এসেছেন। কিন্তু গ্রামোফোন আর রেকর্ডগুলো ফেলে আসতে পারেন নি। এখন বিলু সুর্মাকে প্রায়ই অনুরোধ করেন গ্রামোফোনটা বাজিয়ে রেকর্ডগুলো শুনাতে।

বিবাহিত জীবনে মেয়েদের শখ, ভাললাগা যে কত মূল্যহীন হয়ে যায় এ সমাজে সুর্মার মার মধ্য দিয়ে সেটাই প্রকাশ করেছেন দিলারা হাশেম। সুর্মার মা গান খুব পছন্দ করতেন। নিজে ভাল গান গাইতেন কিন্তু সুর্মার বাবার অপছন্দের কারণে মাকে কোন দিন গান গাইতে শুনেনি সুর্মা। তবে গানের প্রতি মায়ের ভালবাসা অনুভব করেছে। সুর্মার বড় মামা তাদেরকে রেডিওটা কিনে দেবার পর রেডিওতে গান বিলু সুর্মাই শুনতো। কিন্তু সুর্মা দেখেছে গান হতো যখন তখন মা রান্নাঘর থেকে আনাজপাতি উঠিয়ে বিলুদের ঘরের সামনের বারান্দায় বসে কুটতেন। মুখখানায় খুশির রোদ ছড়িয়ে থাকত, আর বেশ স্ফূর্তি করে কাজ করতেন তিনি। সুর্মার মা ছুটা বুয়া কালুর মাকে নিয়ে একলা হাতেই সংসারের যাবতীয় কাজ সামলান। সুর্মা দেখেছে মা কখনও অভিযোগ, অভিমান করেন না। বাবা প্রয়োজনের বাইরে সব কিছুকে অকেজো মনে করেন বলে শৌখিন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তার শখের কথা কখনও বলেন না। মার আত্মসম্মানবোধটাও টনটনে। তাই ববির জন্মদিনে সুর্মার খালি

Dhaka University Institutional Repository

হাতে যাওয়া পছন্দ হয়নি তার। নিজের চারটা সুন্দর লাল গালার মোটা চুড়ি ওর হাতে দেন ববিকে দেয়ার জন্য।

২৬ শে মার্চের ভয়াবহতা, পিঁপড়ার মত গুলি খেয়ে বা পুড়ে মানুষের মৃত্যু, বিলুর কঠিন রোগ– বিলুর সর্বোচ্চ আয়ু চল্লিশ বছর, ক্ষুধার জ্বালায় রেজাদের বাড়ীর দেয়ালে আশ্রয় নেয়া কঙ্কালসার লোকটির মৃত্যু– সমাজের এই ভয়াবহ চিত্র সুর্মার বিধাতার উপর বিশ্বাসের ভিত্তিকেই যেন নাড়িয়ে দেয়। তার মনে হয় সব অভিশাপ কি শুধু মানুষের জন্যই?

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে একদিকে দেখা দেয় অনাহার ও দুর্ভিক্ষ। স্রোতের মত মানুষ আসছে ঢাকায় খাবারের আশায়; ক্ষুধার্ত মানুষ মরে পড়ে থাকছে রাস্তায়; বাড়ির দোরগোড়ায় সন্তান রেখে চলে যাচ্ছে মা; আবর্জনা থেকে খাবার খুঁজে খাওয়া শুধু নয়, ক্ষুধার জ্বালায় বমিও খাচ্ছে মানুষ। এমন সব দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্যাসে। সুর্মার বাবার মতো মধ্যবিত্তরা সোনা-দানা, জায়গা-জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়েছেন। শিক্ষিত যুবকরা ব্যাপক সংখ্যায় দেশ ছেড়ে পাড়ি জমাচ্ছে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় চাকরির সন্ধানে নিরুপায় হয়ে। অন্যদিকে মাহফুজ, মাখন, লায়লা, ববির মা-বাবা হঠাৎ করেই অর্থবান হয়ে উঠেছে। এই অর্থবান হয়ে উঠার বিষয়টি জানার নয় বোঝার। এই সমাজ বাস্তবতাটাই তুলে ধরেছেন দিলারা হাশেম।

বেনু আপার কাহিনীর মধ্য দিয়ে দিলারা হাশেম দেখিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন মানুষকে কি প্রবল শক্তি যুগিয়েছিল। বেনু আপার স্বামীকে ২৫ শে মার্চ রাতে পাক সেনারা ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরেছিল। তার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। ধরা পরলে পাকিস্তানী সৈন্যরা তার শরীর থেকে সব রক্ত বের করে নিয়ে তাকে হত্যা করেছিল। বেনু আপা এই মৃত্যু নিয়ে গর্বিত। দেশের মুক্তির জন্য তাঁর সন্তান মারা গেছে। বরং তাঁর বেদনা হয় স্বামীকে মরতে হলো অসহায়ভাবে গুলি খেয়ে।

দিলারা হাশেম স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং সেই বেদনা থেকে উত্তরণের চেষ্টা জাহেদ, সুর্মা, বিলুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। সুর্মা ভালবাসে জাহেদকে। জাহেদ কবিতা লিখে, সংবাদপত্র অফিসে কাজ করে। দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে জাহেদ। সংবাদ সংগ্রহে নানা জায়গায় যেতে হয় তাকে। দেশের দুর্দশার চিত্র দেখে তার মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সুর্মার মধ্যে একটি নতুন জীবনোপলব্ধির অন্বেষণ আছে। সে একদিকে দেশের এই দুর্দশার চিত্রে বিপর্যস্ত হয়, দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার একটা তীব্র তাগিদ অনুভব করে। তেমনি তার নিজের জীবন নিয়েও রয়েছে নানা

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞাসা, জাহেদের সাথে তার সম্পর্কের খুঁটিনাটিও উপলব্ধির গভীরতা দিয়ে পরিমাপ করতে চায় সে। সে কবিতা পড়ে, প্রচুর গল্প উপন্যাস পড়ে। তারই আলোকে জীবন পর্যবেক্ষণের একটা প্রচেষ্টা আছে তার। কোন নির্ভরতা বা বন্ধনের মধ্যে নয়, একটা স্বাধীন ভিত্তির উপর স্থাপন করতে চায় সে তার প্রেমকে।

সুর্মা খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে, বিশেষ করে পোট্রেট। মেয়েদের নানা ভঙ্গির ছবি আঁকতে তার অসম্ভব ভালো লাগে। দশ বছর বয়সে সুর্মা একটা ছবি এঁকেছিল– সন্ধ্যাবেলা পাটি বিছিয়ে চুল বাঁধছে একজন নারী। ব্লাউজ ছাড়া শাড়ী পড়া ছিল তার, পাড়ের ধার থেকে উকি দিচ্ছিল তার আশ্চর্য সুন্দর বুক। ছবি আঁকার পর সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছিল ছবির মহিলার মুখে একেবারে তার মায়ের আদল। ছবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। সেটাই টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল ক্লাশরুমে। সে ভেবেছিল ছবি দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে, কত বাহবা পাবে সে। কিন্তু যা ঘটেছিল তাতে হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সে। এই ছবি আঁকার জন্য হেড মিসট্রেস তাকে তিরস্কার করেই ক্ষান্ত হননি বাবাকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন স্কুলে। বাবার সামনে সেদিনের সেই অপমানে ছবি আঁকাই ছেড়ে দিয়েছিল সে।

জাহেদের সাথে তার পরিচয়টা হয়েছিল আকস্মিকভাবেই। সন্ধ্যা বেলায় নীলক্ষেতের নীরব রাস্তা দিয়ে একদিন হেঁটে যাচ্ছিল সুর্মা। সাইকেলে চড়ে যাওয়া এক লোক হঠাৎ করে তার বুকে ঝট করে হাত দিয়েই চলে যাচ্ছিল। বিহ্বলভাবে 'চোর চোর' বলে চিৎকার করে উঠেছিল সুর্মা। সে দিন যে লোকটা ঐ বিকৃত রুচীর লোকটাকে ধরেছিল এবং পরে সুর্মাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল সে-ই জাহেদ। তার পর থেকেই ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্কটা তৈরী হয়।

সুর্মা মাঝে মাঝেই নিজের সাথে কথা বলে। বাথরুমই তার বিলাসের জায়গা। সাবান কেনার সামর্থ্য না থাকায় মা ইদানিং বাথরুমে সাজি মাটি রাখেন। প্রথম সাজি মাটি মাখতে গা শিরশির করলেও এখন ভালই লাগে সুরমার। সাজি মাটি মাখতে মাখতে সে চলে যায় পৌরাণিক আমলের রূপকন্যাদের জগতে।

> নিজেকে গুহা গৃহের অজন্তা অথবা বনকন্যা শকুন্তলার মত ভাবতে রোমাঞ্চ হয়েছে সুর্মার। কি মধুর আলস্য তখন ছড়িয়ে থাকতো বাতাসে, সেই কালিদাসের যক্ষ প্রিয়াদের আমলে।..... মুখে তার লোধ্ররেনু, লীলাপদ্ম হাতে, কেন তাদেরই একজন হয়নি সুর্মা।..... সুন্দর ছবির মত নিজেকে জলচৌকিতে স্থিত করে নিটোল অঙ্গে সাজি মাটি

Dhaka University Institutional Repository

ঘষতে ঘষতে সত্যিই যেন সে চলে গেছে যুগ যুগ আগে, যখন পৃথিবীটা রহস্যের চাদর পরে সৌন্দর্যে আবৃত থাকত ।[৭]

গোসল সেরে জাহেদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে গিয়েই তার মনে হয়–

ভালবাসা কি দিনের পর দিন- বছরের পর বছরে আস্তে আস্তে শরীর পায়? না কি একটি আশ্চর্য মুহূর্তে হঠাৎ করে জন্ম হয় তার?[৮]

রিকশায় উঠে শহরটাকে ঝিমানো মনে হয় । সে আপন মনে শামসুর রাহমানের কবিতা আউড়ায় । রাস্তা দিয়ে যেতে যেতেই সুর্মার মনে পড়ে মাত্র তিন বছর আগে ৭১-এ তারা এই রাস্তা দাপিয়ে বেড়াত । তাদের কণ্ঠে মুখরিত হতো শহরের বাতাস । জাহেদ মাখনদের পাশাপাশি ভীষণ উৎসাহে হৈ চৈ করে মিছিলে নামত তারা । কিন্তু এখন যেন শহরটা কেমন ঝিমিয়ে গেছে । তার শরীরে ক্লান্তি নেমেছে । দৃষ্টি হয়ে গেছে ম্লান..

ভীষণ বুড়িয়ে গেছি ইদানীং আমরা সবাই

বেশ জুবুথুবু লাগে নিজেদের বেলা অবেলায়

আমরা সবাই বুড়ো ।[৯]

কিন্তু পর মূহূর্তে তার ভাবনার মোড় ঘোরায় সে । নিজের মধ্যে এক ধরনের দৃঢ় প্রত্যয় খুঁজে পায় সে–

সেই "বালককে" তাদের খুঁজে বের করতেই হবে ।[১০]

প্রেসক্লাবে পৌছে দেখে জাহেদ তখনও এসে পৌছেনি । ক্যান্টিনের টেবিলে বসে আঁকতে শুরু করে সে ।

জাহেদের কবিতায় তার জীবনোপলব্ধির প্রকাশ ঘটে–

তাঁর সব কাজেই জড়িয়ে থাকে পরিমিতির একটা সূক্ষ্ম বাঁধন ।[১১]

জাহেদের সাথে বসে গল্প করতে করতে, জাহেদের চশমা শাড়ীর আচল দিয়ে মুছতে মুছতে সুর্মার মধ্যে তাদের দুজনের নিভৃত ঘরের স্বপ্ন ভাসে । জাহেদের সিগারেট খাওয়া দেখতে দেখতে তার মনে

Dhaka University Institutional Repository

হয় সে কখনো জাহেদকে সিগারেট খেতে বারণ করবে না। ভালবাসার নামে কেউ কারো স্বাধীনতা খর্ব করবে না ওরা। জাহেদ তাকে জানায় গতকাল সে ও মাখন 'সুবচন নির্বাসনে' আর 'এখন দুঃসময়' নাটকের চ্যারিটি শো করতে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিল। তার পর শফিকের বাসায় অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে মাখন আর জাহেদ মিলে রেসকোর্সে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। রিক্সা না পেয়ে গল্প করে হাঁটতে হাঁটতে তাদের মনে হয়েছিল তারা বাড়ী পৌঁছে গেছে। ঘুমিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে তারা রেসকোর্সে নিজেদের আবিষ্কার করে। সুর্মা বুঝতে পারে শফিকের বাসায় তারা কিছু গিলেছিল তাই এই টালমাটাল অবস্থা। এর মধ্যেই জাহেদ জানায় আজ সুর্মাকে একটা বাসা দেখাতে নিয়ে যাবে। বেশ দূরের পথ, তাই ছুটি নিয়েছে। এ খবরে কেমন একটা পৃথক বোধ অনুভব করে সুর্মা। জাহেদের বন্ধুরা এসে এ সময় তাদের টেবিলে আড্ডা জমায়। জাহেদ সালেকের সাথে সাহিত্য আলোচনায় মেতে উঠে। সুর্মা অনুভব করে মাহফুজ আর তরিকুল ইচ্ছে করে একেবারে তার গা ঘেঁষে বসে। এই আড্ডাতেই তারা জানতে পারে মাহফুজ গাড়ী কিনেছে, আর আবিদ বিদেশ যাচ্ছে। সুর্মার অনেক বন্ধু বান্ধব ইদানীং বিদেশ চলে যাচ্ছে। সুর্মার মনে হয় সারা জীবনের জন্য দেশ ছাড়ার কথা সে ভাবতেই পারে না। পর মূহূর্তেই মনে হয়-

> কে জানে, আবিদের মত নিরূপায় হলে হয়তো তাকেও যেতে হবে।[১২]

দুপুরে তারা বাসে করে রওনা দেয় বাসা দেখতে। বাসে বসে জাহেদই সুর্মাকে বলে-

> গাড়ী বাড়ী, পয়সা কড়ি, কোনটার জোর নেই। তোমার ওপর নিজেকে চাপিয়ে দিচ্ছি কিনা জানাতে দ্বিধা করো না।[১৩]

শহর থেকে দূরে ঐ বাড়ীটাতে পৌঁছে সত্যিই খুব ভাল লাগে সুর্মার। ভবিষ্যতের ঘরকন্নার ছবি কল্পনায় আঁকে সে। এখানে এসে যেন অন্যরকম জাহেদকেই সে পায়। জাহেদের জীবনের খুব কম কথাই সে এতদিন জানত। এখানে এসে জানতে পারে জাহেদের জীবনের প্রথম নারী লতিফার কথা। এ সময় জাহেদ সুর্মাকে জানায় যে, মাখন তাকে বলেছে সে একটা সিনেমা বানাতে যাচ্ছে যার নায়িকা করবে সুর্মাকে। আজ দুপুরে ববির বাসার পার্টিতে সেই প্রস্তাবই দেবে মাখন। হঠাৎ সুর্মার মনে হয় ঐ পার্টিতে যাওয়া ঠেকানোর জন্যই বোধ হয় জাহেদ তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এই বিষয়ে জাহেদের কিছু তিক্ত কথায় অসহায় বোধ করে সুর্মা। তার মনে হয়-

> তাদের দুজনের মাঝখানে কোন বারণের ব্যবধান থাকবে না, থাকবে না কোন ভয়ের শাসন। ..... ভালবাসা একটা শক্তি, কিন্তু শর্তহীন অধিকার নয়।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

কৌশলে ববিদের পার্টিতে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখার জাহেদের এই চেষ্টায় রাগে অভিমানে সুর্মার চোখে পানি এসে যায়। এর পরই জাহেদ রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে চটে যায় সুর্মা। সে স্পষ্ট জাহেদকে জানিয়ে দেয় রেজিস্ট্রি বিয়ে সে করবে না। রাগ করে ঐ বাড়ী থেকে বেড়িয়ে একাকী ফেরে সে। জেদ করেই সে ববির বাসায় যায়। বিটপী'র ফিবা ফ্যাব্রিক্স এর জন্য তোলা ছবির জন্য দুশো টাকা দেয় মাখন। তার পারিশ্রমিক। প্রবল অর্থ কষ্টের মধ্যে বিষয়টি আনন্দ দেয় তাকে। সুর্মার মধ্যে এ সময় নায়িকা হবার একটি সুপ্ত বাসনাও জাগে।

> জীবনে যা সে পায় নি তারই মধ্য দিয়ে সে বেঁচে উঠবে ছবির নায়িকা হয়ে।[১৫]

প্রথম অবস্থায় সে মাখনের কাছ থেকে গল্পটাও শুনে। কিন্তু এক সময় সে টের পায় অর্থ আর ক্যারিয়ারের একটা ফাঁদ পেতেছে মাখন। সেখানে আটকে যাওয়া তার উচিৎ হবে না। তাই দৃঢ়তার সাথে মাখনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় সে। এ সময়ই ববিদের বাসায় বিলু ফোন করে জানায় বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অফিসেও যান নি বাসায়ও কিছু বলেন নি। সুর্মা দ্রুত বেড়িয়ে আসে ববির বাড়ী থেকে। মাখনের গাড়ী দিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সে। বাইরে বেড়িয়েই জাহেদকে দেখতে পায় স্কুটারসহ অপেক্ষা করতে। পরম নির্ভরতায় সে উঠে বসে জাহেদের সাথে। পথেই জাহেদের কাছে জানতে পায় বাবা এ্যারেস্ট হয়েছেন ভেজাল ঔষধ আর চোরাকারবারীদের সাথে। বেশী মাত্রায় সৎ নিষ্ঠাবান বাবার এই খবরে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায় সুর্মা। জাহেদ সুর্মাকে নামিয়ে দিয়ে সুর্মার বাবার জামিনের চেষ্টায় যায়।

সুর্মা দেখে তাদের পাশের বাড়ীর দেয়াল ঘেঁষে যেখানে ছিন্নমুল না খাওয়া মানুষটি দুদিন ধুঁকে ধুঁকে আজ সকালেই মারা গেল সেখানেই আরেকটি ছিন্নমুল পরিবার এসে ছালা চট বিছিয়ে বসেছে। দরজায় টোকা দিতেই মা দরজা খুলে দিলেন। লণ্ঠন হাতে মাকে খুব বিপর্যস্ত লাগে। মা জানান নানা খুব অসুস্থ বোধ করছেন। ডাক্তারকে ফোন করে এসে নানার পাশে বসে সুর্মা। মা জানান নানা তার জন্য একটা বাক্স খুলে দিয়েছেন যেখানে সুর্মার জন্য নানীর বেশ কিছু অলংকার রয়েছে। তীব্র বেদনায় সুর্মার চোখ ভরে অশ্রু নামে। সে প্রার্থনা করে অন্তত আর একবার আল্লাহ যেন নানাকে ফিরিয়ে দেন। সকালে নানা খুব করে মিষ্টি খেতে চেয়েছিলেন বলে সে ববির বাসায় তাকে দেয়া মিষ্টি প্যাকেটে ভরে নানার জন্য নিয়ে এসেছে। কিন্তু নানাকে খাওয়াতে পারল না। ডাক্তার আসার আগেই নানা মারা গেলেন। মার সাথে কথা বলে সুর্মা বুঝতে পারে বাবা যে নানার ঔষধ বিক্রি করে দিচ্ছেন

Dhaka University Institutional Repository

মা তা টের পেয়েছিলেন। কিন্তু বিলুর চিকিৎসার চিন্তায় মা কিছু বলতে পারতেন না বলে মনে হয় সুর্মার। সুর্মা নিজের মাঝে এক শূন্যতা অনুভব করে–

> নানার জীবনের মেয়াদ ছোট করে মা বিলুর হায়াৎ খরিদ করতে চেয়েছেন।[১৬]

বিলু বাড়ী ফিরলে মার কাছে বাবার কথা শুনে মনে প্রচন্ড আঘাত পায়। রাগে উত্তেজনায় বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যায় সে। অনেক রাতে জাহেদ বাবাকে নিয়ে ফিরে আসে। বিলুও ঘরে ফিরে নীরবে বাবার ঘরে যায়। বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। নীরবে এ দৃশ্য দেখে বেড়িয়ে আসে সুর্মা।

রান্নাঘরে রান্না চড়িয়ে দেয় সুর্মা। পাশে পিড়ি পেতে বসে জাহেদ মৃদু স্বরে কথা বলে। এ সময় জাহেদ জানায়,

> মাকে খুন করার দায়ে আমার আব্বার ফাঁসি হয়েছিল, এ কথা শুনলে পারবে তুমি আমাকে পাশে নিয়ে তোমার বাবার সামনে দাঁড়াতে না তোমার বাবাই পারবেন তোমাকে আমার হাতে তুলে দিতে?
>
> শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সুর্মা। তারপর বলল, পারব। আর বাবা পারবেন কিনা, তাও আমাদের তার সামনে দাঁড়িয়েই দেখতে হবে। আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করলে মানুষের নিজের পরিচয়ের চেয়ে যে তার পশ্চাৎপটের গুরুত্বই বেশী, সেটাই প্রমাণ করা হবে। তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।[১৭]

জাহিদ তীব্র আবেগে মুখ ঢেকে কাঁদে। এও জানায় তার বাবা মাকে খুন করেন নি, ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীর কাছে তিনি খুনিই রয়ে গেছেন। এ সময় সুর্মার মনে হয় জাহেদকে কি বলে স্বান্তনা দিবে সে?

> বেদনা যেখানে গভীর সেখানে নীরবতাই ভাষা।[১৮]

এরপর অনেকটা সময় নীরবেই কেটে যায়। নানার জন্য এতক্ষণে আকুল হয়ে কাঁদে সুর্মা। এক সময় শান্ত হয়। জাহেদ তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায়। দুপুরে দেখা পাখির কলরব পূর্ণ সেই বাড়িটি ঘিরে যেন সে স্বপ্নের ছবি আঁকে।

এভাবেই শেষ হয়েছে দিলারা হাশেমের 'একদা এবং অনন্ত' উপন্যাসের কাহিনী। কিন্তু এর মধ্যেই বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী হতাশা, নৈরাশ্য, দুর্ভিক্ষ, কিছু মানুষের সীমাহীন লোভ-

Dhaka University Institutional Repository

লালসা, অনৈতিকতা। এসব কিছু দেশটাকে যেন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে সুর্মা চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবনের সকল বাধা, প্রলোভন অতিক্রম করে, দৃঢ়তার সাথে জীবনের নতুন বোধ ও উপলব্ধি সঞ্চারের মধ্য দিয়ে ঋজু ভঙ্গিতে স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় চিত্রিত করেছেন দিলারা হাশেম কাব্যময়, স্নিগ্ধ, উপমা সমৃদ্ধ ভাষায়।

আমলকীর মৌ

জীবনকে নিজের মত করে দেখা, নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা, নারীর ওপর সমাজের চাপিয়ে দেয়া সকল বাধানিষেধ অতিক্রম করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রত্যয় ও শক্তি যাদের আছে তাদেরই প্রতিনিধি দিলারা হাশেমের 'আমলকীর মৌ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সারা। সারার জীবনের সংগ্রাম, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তার লড়াই, নীতি নৈতিকতার প্রতি নিষ্ঠা, আপন জীবন নিজের মত করে যাপন করার অধিকার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় এসব কিছুই কাব্যিক ভাষায় উপস্থাপন করেছেন দিলারা হাশেম। সারার এই লড়াই তার একার। চারপাশের পারিপার্শ্বিক রূঢ়তা ও ক্রূঢ়তায় অনেক সময় বিপর্যস্ত হয়েছে সে। তীব্র বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছে তার মন। তবু কখনও থেমে যায়নি সে। স্বাধীন ও দুর্বার মনোবল নিয়ে নারীর স্বাধীন বিকাশে, সমাজের বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার সংগ্রামী ব্রতে এগিয়ে গেছে সারা। জীবনের সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজের মত জীবন আস্বাদনের চেষ্টা করেছে সারা। এই সংগ্রামে সে বিপর্যস্ত হয়েছে, বেদনার্ত হয়েছে কিন্তু ঋজুতার সাথে তাকে গ্রহণ করেছে।

'আমলকীর মৌ' উপন্যাসে দিলারা হাশেম সারার মধ্য দিয়ে আধুনিক নারীর জীবনজিজ্ঞাসার নানা দিককে উন্মোচিত করেছেন। সমাজ, ধর্মনীতির শৃংখলে মেয়েদের যে জীবন অবদমিত থাকে, স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন অসম্ভব থেকে যায়, স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের কোন ক্ষমতাই থাকে না, এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মেয়েদের জীবনের স্বতন্ত্র একটি উপলব্ধির জগৎ নির্মাণ করতে চেয়েছেন দিলারা হাশেম সারার মধ্য দিয়ে। ফলে পরিবার, সমাজ, প্রচলিত ধর্মের সাথে এক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তার। সমাজের যে মানদন্ডে নারী প্রতিনিয়ত অবমূল্যায়িত হচ্ছে সারা সেই মানদন্ডকে অস্বীকার করে। জীবনে প্রবঞ্চিত, প্রতারিত হয়ে দিশেহারা সালেহা আত্মহননের পথ বেছে নেয়, সকিনারা নির্যাতিতা নিপীড়িতা হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে, কিন্তু জীবনের প্রবঞ্চনাকে দুপায়ে দলে মাথা তুলে দাঁড়ায় সারা, সংগ্রামে হয় ঋজু। আত্মপ্রত্যয়ে হয় অনমনীয়, প্রতিবাদে হয় প্রখর। সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত নিয়মনীতিকে, বাধার প্রাচীরকে দুর্বার মনোবল নিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা করে সে। একটি নিজস্ব জীবনদর্শন মেনে চলে সে। তৎকালীন তথাকথিত আধুনিক নারীর সাথেও তার মেলে না। যারা ইংরেজীতে কথা বলে, ছোট করে চুল ছেঁটে শাড়ী ছেড়ে স্ল্যাক আর মাঝে মাঝে হাটুর উপর স্কার্ট পরে, পিতৃপরিচয় আর ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রকাশ্যে মদ না ছুঁয়ে সিগারেট না খেয়ে ছেলেদের সঙ্গে সখ্যতা এড়িয়ে আড়ালে যে কোন পছন্দের মানুষের কাছে নিজের চূড়ান্ত গোপনীয়তাকে নিবারণ করে আধুনিকতার বড়াই করে তাদের মনে মনে ঘৃণা করে সারা। নারী যখন বিদ্যা-বুদ্ধিতে তীক্ষ্ম হয় তার যখন মন নামক একটি অনুভূতির আধার আছে, স্নেহ, প্রেম, ভাষা, ভালোবাসা আছে, তখন তা যে একজনের জন্যেই তালা-চাবি দিয়ে তুলে রাখা যাবে, এমন কখনই সম্ভব নয়। অনেকের জন্যেই তার হৃদয়ে একটা নরম আসন পড়তে পারে। কিন্তু সে জন্যে দেহ দিয়ে কনভারসেশন করে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে আসতে হবে- এমন কোন কথা নেই। সেটা আর যেই পারুক সে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক-এ পড়ার সময় সহপাঠী মোস্তাককে বিয়ে করে সারা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পদিনের পরিচিত মোস্তাকের সাথে তার হৃদ্যতা তৈরী হতে না হতেই বিয়ে করে ফেলে তাকে। বিয়ের তিন বছরের মাথায় সন্তান দারার জন্ম হয়। পাঁচ বছরের মাথায় বিয়েটা ভেঙ্গে যায়। স্বামী বলেই তাকে জন্মান্তরের বন্ধনে আটকে যেতে হবে তা মানে না সারা। ভাললাগার ঝোঁকের মাথায় মোস্তাককে বিয়ে করেছিল সে। পরে সে অনুভব করেছে,

> নিয়ন বাতিতে যে, সবকিছুই বেশী চকচক করে। স্পষ্ট দিবালোকে, অথবা ঘরের দীপালোকে তাই যদি মলিন বোধ হয়, ভালো লাগা যদি ভালবাসা না হয়ে উঠতে পারে, তাহলে তার মত বিড়ম্বনা যে আর কিছুই নেই।[১৯]

শুধু তাই নয়–

> একটা সুন্দর জিনিষকে প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে বিকৃত হতে দেখলে সে কষ্ট যে অসহ্য। সে আমি আর সইতে পারছিলাম না। সেই কষ্টের মুক্তির জন্যই ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি ফিরোজ। এখন আর কষ্ট নেই।[২০]

তার এত দ্রুত বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়াটাকে তার নিজের কাছেও খুব অস্বাভাবিক লেগেছে। পরে তার মনে হয়েছে কিশোর বয়সে বড় আপার মোহন মাতৃমূর্তি দেখে সেই যে মা হওয়ার স্বপ্ন বাসা বেঁধেছিল বুকে-

Dhaka University Institutional Repository

> সেই আকুলতাই বুঝি তাকে পূর্বাপর চিন্তার অবকাশ দেয়নি। প্রথম ঝোঁকেই নিয়তির মত ঠেলে দিয়েছিল মোস্তাকের কাছে। মা হবার জন্যে হলেও একবার তাকে বিয়ে করতে হবে।[২১]

বিয়ের দুবছরে বাচ্চা না হওয়াতে সেই মোস্তাকের কাছেই তাকে কথা শুনতে হয়েছে-

> যাদের হয় তাদের এতদিন লাগে না, বছর ঘুরতেই বাচ্চা হয়। আমি বাবা মার একমাত্র সন্তান, বাচ্চা তো আমার চাই।[২২]

মোস্তাকের কাছে মা হতে না পারার জন্যে কটুক্তি শুনে বিপন্ন বোধ করেছে সারা। অথচ মাতৃত্বের আস্বাদনের জন্য পূর্বাপর বিবেচনা না করে মোস্তাককে বিয়ে করেছিল সে।

সন্তানের আগমন বার্তা সূচীত হওয়ার সাথে সাথে একটি বিভোরতায় নিমজ্জিত হয়েছিল সারা। পাগলের মত সন্তানের চিন্তায় সারাক্ষণ অস্থির থাকত সে। এর মধ্যেই মোস্তাকের মধ্যে যে একটি বিমূখতা তৈরী হয়েছে, দূরে সরে যাচ্ছে মোস্তাক তার কাছ থেকে তা লক্ষ্য করার সময়ও হয়নি সারার। মোস্তাক কিছুটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল সারার জীবনে। এক সময় মোস্তাকের তিক্ত ব্যবহারে অসহ্য হয়ে উঠত সারা।

> কতদিন দারাকে নিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন পথে পথে ঘুরত ঘন্টা হিসেবে রিক্সা ভাড়া নিয়ে। দারাকে ঝাপটে ধরে চুমু দিয়ে বলত তুই বড় হয়ে যা দারা, তোকে নিয়ে আলাদা বাসা করে থাকব আমি। তোর বাবার মেজাজ আর সহ্য করব না।[২৩]

অনেক সময় বাবার বাড়ি 'কাকলী কুঞ্জে' দারাকে নিয়ে যেত। মা, রুনু, ঝুনু, মিনুদের কোলেকাঁখে খেলে বেড়াত দারা।

এক সময় মোস্তাকের নীচুতা, বিকৃতিকে আর সহ্য করতে পারল না সারা। যেদিন মুক্তি চাইল সেদিন মোস্তাকের নীচতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সারা। নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে মোস্তাক জানিয়েছিল দারা তার কাছে থাকবে। আর দেনমোহরের টাকা দেবে না মোস্তাক। শুধু তাই নয় গুলশানে একটি ছোট জমি বাবার বন্ধুকে ধরে এ্যালটমেন্ট করিয়েছিল সারা। নিজের চাকুরীর বেতন দিয়ে এক বছর যাবৎ ব্যাংক ঋণের কিস্তি শোধ করেছে সে। সেই জমিটাও চাইল মোস্তাক। তখন পরম বিতৃষ্ণায় একটি ধিক্কারই জন্ম নিয়েছিল তার ঠোঁটে–

Dhaka University Institutional Repository

ছি মোস্তাক, ছি তুমি এত নীচ।[২৪]

তারপর সন্তান, টাকা, জমি, সবকিছুর দাবি ছেড়েই বেড়িয়ে এসেছিল সারা। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুর মতই যেন সারার উচ্চারণ,

> সেই দিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিও। ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।[২৫]

একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে পিএইচডি করতে ইংল্যান্ডে চলে যায় সারা। চার বছর পরে আবার দারার কাছাকাছি থাকার জন্য ফিরে আসে দেশে। তার এই স্বাধীন জীবনযাপন পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে অনেকেরই ভাল লাগে না। ফলে বিদেশের উচ্চতর ডিগ্রী ও এত ভালো ফলাফল থাকা সত্ত্বেও দেড় বছর বেকার থাকতে হয়েছে তাকে। রাষ্ট্রের কর্ণধার বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে তবেই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি পেয়েছে। শুধু বাইরে নয় এ সময় তার বাড়ীতেও তার জীবনযাপন নিয়ে কথা উঠতে থাকে।

সারা বন্ধুত্বে নারী পুরুষ ভেদ করে না। যে কোন পুরুষ বন্ধুর সাথে সেক্স থেকে শুরু করে সাইকোলজি পর্যন্ত যে কোন প্রসঙ্গ নিয়ে খোলামেলা তর্ক চালায়। তবে সেই বন্ধুত্বেরও ভদ্রতা, সৌজন্যের সীমা রক্ষা করে চলে সে সব সময়। সমাজের কাছে নয় বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকে সে।

শুধু মেয়ে বলেই অনেক কাজ তার নিষিদ্ধ। ছোটবেলা থেকে একথা সে অনেকবার শুনেছে। এই কথাটি তাকে ব্যথিত করেছে বহুবার। সেই থেকে সে নারী পুরুষের ভেদাভেদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সারা জীবন ধরে সেই যুদ্ধই করে গেছে। জীবনে চলার পথে যা তাকে টেনেছে তাতেই নিমগ্ন হয়েছে, কারো অসুবিধা সৃষ্টি না করে, বিবেকের কাছে পরিষ্কার থেকে। কিন্তু তার স্বাধীন চলাটাই পছন্দ হয়নি সমাজের। ক্রমাগত বিদ্ধ করেছে সমাজ তাকে। স্বামীর পরিচয় মাথায় এঁটে লুকিয়ে চুরিয়ে যত অন্যায় করা হোক তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই সমাজের, কিন্তু মাথা উচু করে নারী তার স্বাধীন সত্তার প্রকাশ ঘটালেই যেন ঘটে প্রলয়। সারা সেই প্রলয়ের মাঝখানেই স্থির থেকেছে দৃঢ়তার সাথে। মোকাবেলা করেছে, কিন্তু এই নৃশংসতায় ব্যথিত, রক্তাক্ত হয়েছে তার উদার মানবিক বোধ।

Dhaka University Institutional Repository

একাকী বসবাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ার্টারের জন্য আবেদন করেও কোয়ার্টার পেতে ব্যর্থ হয় সারা। শেষ পর্যন্ত ছাত্রী হোস্টেলে একটি রুম বরাদ্দ নেয় সে।

বাবার বন্ধুর ছেলে হাসিব সারার চেয়ে বয়সে ৬/৭ বছরের বড়। হাসিব সারার জীবনের আরেকটি বড় অধ্যায়। হাসিবের বন্ধুত্ব ছিল সারার মেঝ ভাই হারুনের সাথে। সারার তরুণী বয়েসে হাসিব আসত ওদের বাড়ীতে নিয়মিত। একবার সারার টাইফয়েড হলে সে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তখন তার বয়েস ছিল ১৩। টাইফয়েড হওয়ার আগে সে তার কাজিন ফরিদের প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু ফরিদ অন্য মেয়ের প্রেমে পড়লে সারা মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হাসিবের সঙ্গে তখন তার খুব সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠে। হাসিবকেই সে তার জীবনের ব্যর্থতার কথা বলে কেঁদে ফেলেছিল। হাসিব পরম বন্ধুর মত সারার এই বেদনায় তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাকে উপদেশ দিয়েছিল-

> মনে রেখো জীবনের কাছে মার খাওয়া আর জীবনের কাছে হার মানা এক কথা নয়। মার তুমি খেতে পারো, জীবন সবাইকে সবকিছু দেয় না– কিন্তু আদায় করার চেষ্টা ছাড়বে কেন? জীবনের কাছে কোনদিন হার মেনো না।[২৬]

এই উপদেশবাক্যই তার জীবনের বেদবাক্য হয়ে গেল। শুধু তাই নয় হাসিবের প্রতিও সে গভীর ও প্রগাঢ় ভালবাসা অনুভব করেছিল। কিন্তু হাসিব তখন বড় ভাই সেজে নিজের ইচ্ছাটাতে ভব্যতার খোলস পরিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া সে লন্ডনে বোর্ডিং থেকে পড়তো বলে ছুটি শেষে চলে যেত। ফলে সারার জীবনে আবারও তীব্র ব্যর্থতার অনুভূতি সৃষ্টি হল। এমনকি সে সময়ে সারার একবার আত্মহত্যারও ইচ্ছা হয়েছিল। পরে সে হাসিবকে বলেছিল -

> কিন্তু তোমার সে উপদেশটাই আমাকে রক্ষা করেছিল। মার খাবো, কিন্তু হার মানবো না। তার পরেও মার খেলাম, কিন্তু হার মানলাম না। আদায়ের চেষ্টা ছাড়লাম না। মোস্তাক এলো - মোস্তাক গেল। আমি আমিই রইলাম।[২৭]

পরে হাসিব জীবনের পূর্ণ ডালা নিয়ে এলেও ততদিনে সারার জীবনের পথ অনেকখানি আলাদা হয়ে গেছে। হাসিব এখনও তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, সবচেয়ে বড় আশ্রয় হয়েই রইল কিন্তু হাসিবের প্রতি সেই তীব্র ঝোঁক, প্রগাঢ় অনুভূতির কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না।

এই সময় তার চারপাশে অনেক বন্ধু ভীড় করল। তখন সে সমাজের সকল বাধা অতিক্রমের চেষ্টা থেকে মদ ধরল, সিগারেট খেতে শুরু করল। কিন্তু মদ খেয়ে কোনদিন সে মাতাল হয়নি বা

Dhaka University Institutional Repository

সিগারেটের নেশাও তার কোন দিন হয়নি। শুধু প্রথা ভাঙ্গার ঝোঁক থেকে নারীত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতেই সে এরকম আরো অনেক আচরণ করতে লাগল।

বাবা আজম খান ও মা মাজেদাসহ এগারো ভাইবোন নিয়ে 'কাকলী কুঞ্জে' তাদের জমজমাট সংসার ছিল। সারার বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের শিক্ষক। সারাদিন লাইব্রেরীতে বসে সম্মেলন সেমিনারের জন্য লেখা তৈরী করেন। বই পুস্তকে ক্লান্তি এলে বন্ধুদের ডেকে লাইব্রেরীতেই দাবার ছক বিছিয়ে বসেন। এগারোটি সন্তানের সবকটিকে বোধকরি তিনি ঠিক করে চেনেনও না।

> তাদের চোখে আব্বা নামধেয় মানুষটি শুধুমাত্র একটা অস্তিত্বই। .....আর এই আব্বা মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সন্তানের পক্ষে অশালীন কতগুলো কুচিন্তা প্রায়ই তার ভাবনাকে কলঙ্কিত করে। যে লোকটা দিনের বেলায় আম্মা মানুষটার সঙ্গে প্রায় সম্পর্কবিহীন দিন কাটায়- সে রাতে কোন সম্পর্কের দাবিতে এবং কিভাবে অতগুলি সন্তানের পিতৃত্বের অধিকারী হয়![২৮]

তাঁদের এই অস্বচ্ছ দাম্পত্য সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সারা আম্মাকে অবহেলিত, অত্যাচারিত একটা অস্তিত্ব হিসেবে কল্পনা করে।

এ সংসারের সকল ভার দায়-দায়িত্বই ছিল মা মাজেদার উপর। এগারো সন্তানের বিরাট সংসার, পরিবার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন দার্শনিক স্বামীর সকল দেখভাল থেকে শুরু করে 'কাকলী কুঞ্জে'র জমি কেনা, বাড়ী বানানো, ইঁটের প্রতিটি গাঁথুনির খবরও রাখতে হয়েছে মাজেদাকে। মেধাবী সন্তানদের জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনায় মাঝে মাঝেই বিপর্যস্ত হয়েছেন মাজেদা। আবার আপন শক্তিতেই পূর্ণ উদ্যমে সংসারের কাজ করে গেছেন।

সারার বড় বোন নাফীসা বিয়ের আট বছর পর বিধবা হয়ে তিন মেয়েকে নিয়ে ফিরে এসেছিল 'কাকলী কুঞ্জে'। স্বামীর মৃত্যুর পর নাফীসা একেবারে গুটিয়ে ফেলে নিজেকে। একটি স্কুলে চাকরি করে, আর মেয়েদের দেখাশুনা করে– এই তার জীবনের গণ্ডি।

তাদের বড় ভাই মতিন ২১ বছর বয়সে তাদের বাড়ীতে আশ্রিত হাজেরার মেয়ে সকিনাকে বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করলে প্রলয় ঘটে যায় পরিবারে। তাদের বাবা আজম খান– যার সাথে তার সন্তানদের কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই, সংসারের কোন ভাল মন্দের সাথেই যিনি নিজেকে যুক্ত করেন না কোন

Dhaka University Institutional Repository

সময়, যার জীবন পাঠাগারের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ– একথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন–

> অসম্ভব। লেখাপড়া না জানা, অশিক্ষিত একটা বেগার, তাকে বিয়ে করবে মতিন, অসম্ভব।[২৯]

শ্রেণী চেতনা যে সমাজে কি প্রবলভাবে বিদ্যমান এই ঘটনা দিয়েই দিলারা হাশেম স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। মতিনও সে দিন কাঁপা গলায় বলেছিলেন-

> বেশ তাই হবে। কিন্তু আর কোন দিন আমাকে বিয়ে করতে বলবেন না।[৩০]

এই ঘটনার পর মতিন হার্ভাড থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসে এবং বস্তিতে বস্তিতে বয়স্ক শিক্ষার কাজে সারাদিন ব্যস্ত হয়ে পরে।

সারার মেজ বোন সালেহা। দেখতে সুন্দরী বলে পাড়ায় তার অনেক ভক্ত ছিল। এক সময় নিজের পছন্দে বিয়ে করে রশীদকে। কিছু দিনের মধ্যেই টের পায় তার জীবনাদর্শ, তার আকাঙ্খা স্বপ্ন, সৌজন্য মেলে না রশীদের সাথে। ব্যবসায় অনেক অর্থবান হয়ে উঠে রশীদ। ঐশ্বর্য আর বিলাসী জীবনে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় সে। সালেহাকেও এ পথেই আনতে চায়। শরীর নিয়েও জোর করে, কেড়ে নেওয়ার বিষয়ই তার প্রবল। কিন্তু জোর করাতেই আপত্তি সালেহার। আর রশীদের জেদ ওখানেই যে সে জোর করেই আদায় করবে সব।

> কিন্তু পুস্তক-কীট, অধ্যাপক পিতার সংসারে, ... স্কলার নীতিবাগীশ ভাইবোনদের সাহচর্যে,– মাজেদার কড়াকড়ি প্রাচীন আদর্শবাদ ও নীতি অনুশাসনে বড় হয়ে উঠে– সালেহা জীবনের কাছে যে আনন্দের প্রত্যাশী হয়েছে, এই আনন্দ স্ফূর্তির সঙ্গে তার এতটা তফাত যে কোনক্রমেই সে এর সঙ্গে রফা করতে পারে নি।[৩১]

রশীদ জোর করে জান্তব প্রক্রিয়ায় তার শরীর দখল করতে চেয়েছে বলেই সে শীতল বরফ হয়ে গেছে। আর রশীদ আক্রোশে তাকে নিয়ে দাপাদাপি করেছে। সে জানে তাদের বাবার বাড়ী 'কাকলী কুঞ্জে'র সবার মত তারও রয়েছে এক রোখা স্বভাব। সে ভালবাসতে জানে আপোশ করতে জানে না। তার ব্যবসার সাথে মিলিয়ে রশীদ যত তাকে তথাকথিত পোশাকী আধুনিক বানাতে চেয়েছে, জোর খাটাতে চেয়েছে, তত সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। এক সময় রীতিমত পর্দা করতে শুরু করেছে শুধু রশীদের এই জোর জবরদস্তির বিরোধিতার জন্যে। অনেক সময় এ জীবনে হাঁপিয়ে উঠে একা চলে

Dhaka University Institutional Repository

গেছে 'কাকলী কুঞ্জে'। কিন্তু নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে বলে পরিবারের সামনে রশীদের সাথে তার সুখী জীবনের অভিনয়ে সে কিছুতেই যবনিকাপাত ঘটাতে পারে নি। তাই আবার ফিরেও এসেছে বাটালী হিলের এই বাড়ীতে।

> তাঁদের অমতে সে যার হাত ধরে গ্রীবা উন্নত করে বেড়িয়ে এসেছিল, যে-কোন মূল্যে গ্রীবা তাকে উন্নত রাখতেই হবে।[৩২]

সালেহা অনুভব করে রশীদকে সে এখনও ভালবাসে–

> অস্তমুখী সূর্যের আভা যখন বাটালী হিলের চূড়ায় চুম্বন আঁকে, সেই সন্ধ্যা লগ্নে হাতে হাত ধরে রশীদ তার সঙ্গে কোথাও হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে বসলে কি হত তা বলা যায় না।[৩৩]

নারীর একটা নিজস্ব সত্তা আছে। তার সাথে সম্পত্তির মত আচরণ করা যায় না এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেড়ে উঠা রশীদ তা অনুভব করতে পারে নি। তাই রশীদের চরম পুরুষতান্ত্রিক আচরণ একটা সুন্দর দাম্পত্য জীবনের সম্ভাবনাকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

নাফীসার মেয়ে রুনুও নিজের পছন্দে পাশের বাড়ীর আশফাককে বিয়ে করে ঘর ছাড়লে আরেকবার প্রলয় দেখা দেয় 'কাকলী কুঞ্জে'। মেঝ ভাবি আর মা-এর কথায় অপমানে অভিমানে নাফিসা বাড়ী ছেড়ে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে উঠে সিদ্ধেশ্বরীতে ভাড়া বাড়ীতে।

এ সময় রশীদের পি.এ.-এর সঙ্গে রশীদের অন্তরঙ্গ ছবি দেখে সালেহা সব ছেড়ে দিয়ে 'কাকলী কুঞ্জে' ফিরে আসে, তার অল্পদিন পরেই মারা যান তাদের মা মাজেদা। এই অবস্থায় নাফীসা ফিরে আসে বাড়ীতে- 'কাকলী কুঞ্জে'। কিছুদিন পর রশীদ সালেহাকে নিতে এলে এক রকম জোর করেই বাবা তাকে পাঠিয়ে দেন রশীদের সাথে। পরের দিনই সালেহার আত্মহত্যার খবর আসে 'কাকলী কুঞ্জে'। এভাবে ১১ ভাই বোনের জমজমাট বাড়ীটা একে একে নীরব হয়ে যেতে থাকে।

সারার জীবনে আবার আসে একজন। ফিরোজ শিল্পী, ভাস্কর্য তৈরী করে। প্রথম সাক্ষাতেই তার প্রতি এক ধরনের প্রগাঢ় আকর্ষণ অনুভব করে সারা। অল্প দিনের পরিচয়ের সূত্রেই ফিরোজের অনুরোধে ফিরোজের সাথে তাদের বাড়ী মানিকগঞ্জে ঘুরে আসে। ফিরোজের বিষয়টি হাসিবকে বলতে গিয়েও ফিরে আসে সারা। হাসিব তখন তার বাবার সাথে যশোর-এ, জমি-জমা সংক্রান্ত কাজে। একই সাথে ফুপাতো বোন লাইজুকে দেখানোও হাসিবের বাবার উদ্দেশ্য। এ সময় লাইজুর ঝড়ো আহ্বানে–

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন বিদেশে জীবন যাপন, সারার সাথে একই বাড়ীতে একাকী রাত্রি যাপনের সময়ও সামাজিক ভব্যতাবোধের কারণে যার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গেনি– তা এবার ভেঙ্গে পরে। তার কাছে এটি স্খলন বলেই বোধ হয়। সে বিপর্যস্ত বোধ করে। সারার কাছে বিষয়টি জানাতে ছুটে যায় কিন্তু সারার দেখা পায় না। এ সময় লাইজু ঢাকায় তাদের বাড়ীতে আসে, আবারো হাসিবকে তার জীবনে পাবার জন্য তীব্র আকুলতা প্রকাশ করে। কিন্তু হাসিব তার মধ্যে কোথাও লাইজুকে খুঁজে পায় না। মাজেদার মৃত্যুর দিনই সারার সাথে দেখা হয় হাসিবের, এসময় আকুলভাবে সারা তাকে বিয়ে করার অনুরোধ জানিয়ে বলে–

> বিয়ে করে সংসারী হও, তারপর ইচ্ছা হয় বিদেশে যেও। সংসারে সবাই এটা তোমার কাছে আশা করে। তাদের নিরাশ করে আমাকে অপরাধী করো না।[৩৪]

এরপরই কেবল লাইজুকে বিয়ের সম্মতি জানিয়ে দেয় হাসিব।

সারা ফিরোজের জন্য একটা কাজ জোগাড় করেছিল। সেই কাজ করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পরে ফিরোজ। তাকে সামান্য আনন্দে রাখতে ফিরোজকে সাথে নিয়ে গিয়েছিল কক্সবাজার। সেখানে গিয়ে ফিরোজ আরো অসুস্থ হয়ে গেল। ধরা পড়ল সে ক্যান্সার আক্রান্ত। শুধু ফিরোজের যদি কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে সেই জন্যই আমেরিকায় আরেকটি স্কলারশিপ জোগাড় করে ছুটি পেতে ব্যর্থ হয়ে চাকরি ছেড়ে দেয় সারা। কিন্তু ফিরোজ মারা যায় তার আগেই। সারার জীবনের রং একেবারে ধূসর হয়ে যায়।

ফিরোজ যেদিন মারা যায়, সেদিনই ছিল হাসিবের বিয়ে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে সারার কাছে আসতে আসতে অনেক রাত হয়ে যায় হাসিবের। সারার জীবনের সকল দুঃখ শোকের মুহূর্তেই হাসিব তার পাশে ছিল। সারাও ছুটে গিয়েছিল হাসিবের পাশে। আজ হাসিবকে সারা ডাকেনি, হাসিবই ছুটে এসেছে তার কাছে এবং অনুভব করেছে -

> সারার জীবনের বিগত সেই সব শোক তথা প্রেমের সঙ্গে আজকের শোকের কোন তুলনা হয় না। ..... সত্যিকার দুঃখের আগুনে জ্বলে এবং নিখাদ প্রেমের শিখায় দীপ্ত হয়ে ছেলেমানুষের খোলসটা ছেড়ে ফেলে এতদিনে যেন প্রথম প্রকৃত বড় হয়েছে সারা।[৩৫]

আবারো জীবনের পথে চলার শক্তি সঞ্চয় করে সারা। দারার সাথে দেখা করার জন্য দিল্লী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। সে জানে নদীর মত জীবনের স্রোতও কখনো থেমে থাকে না, বহতাতেই তার

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্ব। জীবনের সকল জঞ্জাল সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রত্যয় সারার, তার শক্তিতেই সে জীবনের সকল বঞ্চনাকে দু'পায়ে দলে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সংগ্রামে প্রতিবাদে মমতায় এগিয়ে চলে।

এভাবেই অসংখ্য ঘটনা আর জীবনের মধ্য দিয়ে দিলারা হাশেম নারীর আধুনিক জীবনের সংকট আর সম্ভাবনাকে বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় তার বাধা আর অনিবার্য বিকাশকে রূপায়িত করেছেন 'আমলকীর মৌ' উপন্যাসে। সারা চরিত্রের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের আধুনিক নারীর জীবন অন্বেষায়, দ্বন্দ্ব সংঘাতের নানা দিক উপস্থাপন করেছেন সাবলীল ও কবিত্বময় ভাষায়।

রিজিয়া রহমান

ঘর ভাঙ্গা ঘর

শহরবাসী উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তের জীবনাচরণ ও আকাঙ্ক্ষা থেকে একেবারে পৃথক, নদীর ভাঙ্গনে দৈন্যের কষাঘাতে শুধু দু'মুঠো অন্নের জন্যে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা বস্তিবাসী নিম্নবিত্ত মানুষের ক্লেদাক্ত জীবনের ছবি রিজিয়া রহমানের 'ঘর ভাঙ্গা ঘর' উপন্যাস।

জুলেখা, তার মা, জুলেখার বাবা, নানী, আলেকজান, আমিরন, শামছেল, ফুলজান, তার স্বামী আকবর, খালেক, খালেকের মা ও বৌ, অজিফা, হাসেম, ওমরতুন, ময়না, সোনাবড়ু, সমীরণ, তার স্বামী সন্তান আর ফকিরচাঁদদের নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ঘর ভাঙ্গা ঘর' উপন্যাসের বস্তির জীবন স্রোত। এই বস্তিবাসী বাচ্চারা-

> সারাদিনই পথে ঘুরে। ....ময়লা উপচানো ডাস্টবিনের ধারে নোংরা সবুজ জমাট কাদায় ভরা ড্রেনের পাশে, রেশন শপের ভীড়ে, মিউনিসিপ্যালটির কলের তলায় সারাদিন হুটোপুটি করে খেলে বেড়ায় ওরা। সুবিধা পেলেই চলন্ত রিকশা স্কুটারের পিছনে বাদুড়ঝোলা হয়ে মহানন্দে ভ্রমণসুখ উপভোগ করে। আবার কখনো গলিতে দুই একটা জিপ বা ট্রাক ঢুকে পড়লে গাড়ির পিছনে ছোটে চড়বার আশায়।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

কখনও বা-

> কারো রিকশার তলায় পড়ে পা ভাঙল। কেউ বা চলন্ত ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পথের ধারের দেয়ালে পড়ে থেতলে গেল। আবার হারিয়েও যাচ্ছে দু-ছ মাসের মধ্যে দু চারটে।[৩৭]

এভাবেই রিজিয়া রহমান বস্তিবাসীদের জীবনের বাস্তবতাকে রূপায়িত করেছে। এই বস্তির অধিকাংশ মহিলাই বাড়ী বাড়ী ঠিকা ঝি-এর কাজ করে। রাতে একবেলা রাঁধে, বাকী দুবেলা পান্তাভাত নুন মরিচ দিয়ে খেয়ে নেয়।

> মাঝে মাঝে কাজের বাড়ী থেকে দুচারটা বাসী রুটি কি ভাত তরকারি ফাউ পাওয়া যায়। ছেলে মেয়েগুলির সেদিন মহোৎসব যেন।[৩৮]

গ্রামে জুলেখার নানী পড়ে গিয়ে কোমড় ভাঙ্গে, দু হাতে ভর দিয়ে কোন রকমে মাটিতে ছেঁচড়ে চলা নানীকে ঢাকায় নিয়ে এলে জুলেখার মার সাথে বাবার তুমুল ঝগড়া হয়। খাবার আরেকটি মুখ বাড়ল বলে। শেষ পর্যন্ত জুলেখার মা ভিক্ষের জন্য গলির মুখে থালা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে মাকে। তার বার বছর বয়সের মেয়ে আলেকজানকে কাজে দেয় একটি মেসবাড়ীতে। আলেকজান আর তার ছোট ভাই শামছেলের ঝগড়ার মাধ্যমে জুলেখার মা জানতে পারে মেসের সাহেবরা ছোট মেয়ে আলেকজানকে নিয়ে ঘরে কপাট দেয়, বদলে টাকা দেয়। সেদিন প্রবল রাগ আর কান্নায় জুলেখার মার গলা থেকে বেড়িয়ে আসে কষ্টের শব্দের দলা। লোহার বেড়ি দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করে মেয়েকে। অন্যদিকে বড় মেয়ে জুলেখার দ্বিতীয় স্বামীর ঘরেও দিনরাত অত্যাচার। সেখান থেকেও ফিরে আসে সে। তিন বাড়ীতে ঝি এর কাজ নিয়ে ২৫ টাকার আয় বাড়াল সংসারে।

ফরিদপুরের ভেদরগঞ্জের ফুলজান যক্ষা রোগী স্বামীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিল ঢাকায়। ঝি-এর কাজ করে ছেলেমেয়ে নিয়ে কোন রকমে পেট চলে, চিকিৎসার ব্যবস্থা আর হয় না। ওমরজান নাতিকে পেলে পুষে বড় করে। নাতি শহরবাসী হয়ে কিছুদিন তার খরচ পাঠালেও এক সময় বন্ধ করে দেয়। উপরন্তু তাকে ফাঁকি দিয়ে জমিজমা বিক্রি করে দেয়। বাধ্য হয়ে ওমরজান ঢাকায় এসে এই বস্তিতে উঠে। এই বয়সেও দুটো বাসায় ঝি-এর কাজ নেয়। খালেক, খালেকের মা ও বৌ এ বস্তির আরেক ঘর। খালেক চুরি করে কোন রকমে সংসার চালায়। গ্রাম ছেড়ে বস্তিবাসী হয়ে যারা অন্ধকার পাপের পাতালপুরীতে হারিয়ে যায় তাদেরই একজন সোনাবড়ু। নিউমার্কেটে, রমনা পার্কে

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িয়ে খদ্দের খুঁজে সে। দেনার দায়ে শহরে আসে সন্ন্যাসী মনের হাসেম। নিজের মনে গান গায় আর ভাবের ঘোরে থাকে। সংসার বিষয়ে একটা নিরাসক্তি লালন করে নিজের মধ্যে।

এই বস্তিতে আট টাকা ঘর ভাড়ার সমীরনের ঘরেই আছে কিছু স্বাচ্ছন্দ্যের বাতাস। তার জোয়ান স্বামী তাহের আলী অন্ধ খঞ্জ আতুরের ভান করে, কখনও পেটে ঘা আছে, কখনো মা মারা গেছে গোর কাফনের টাকা নেই বলে, কখনো নিজেকে ছাঁটাই হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিক বলে মানুষ ঠকিয়ে ভাল রোজগার করে। বরিশালের ফকিরচাঁদ দেশে থাকতে করত ডাকাতি। ঢাকা শহরে এসে হয়েছে গুন্ডা। তার কোমরে সব সময় গোঁজা থাকে চকচকে ধারালো ছোরা। তবে বস্তির সকলকেই সে সাহায্য করে অকাতরে। তাই বস্তিতে তাকে ধরতে পুলিশ এলে সকলেই প্রার্থনা করে পুলিশ যেন তাকে খুঁজে না পায়।

এরা সকলেই নদী ভাঙ্গনে বা মহাজনের ঋণের জালে নিঃস্ব হয়ে গ্রাম ছেড়ে বস্তিবাসী হয়েছে। বস্তি জীবনের প্রথম দিন থেকেই এরা সবাই বুকের মধ্যে একটি স্বপ্নই লালন করে, মহাজনের দেনা শোধ করার মতো টাকা হলেই বন্ধকী আশ্রয় ফিরিয়ে নিয়ে বা নতুন চর উঠলেই ঘর তোলার মত অর্থ জোগাড় করেই আবার তারা ফিরবে নদীর ধারে সবুজ গ্রামের প্রান্তে। বারবার তাদের মনের প্রান্তে ভেসে উঠে–

> খালের পাড়ে বাম পাশ দিয়ে সরু একটা পায়ে চলা মেঠো পথ। গাব, আমলকি, তেঁতুল আর খেজুর গাছের ছায়ায় ছোট একটি ভিটে।.....বাগানে ঘুরে কচির লতি, পুকুর পাড়ের হেলেঞ্চা শাক, আর গামছা দিয়ে গুড়া ইছা সংগ্রহের আনন্দ। মাঠে গরু চরাতে চরাতে আকাশে ঢাউস ঘুড়ি ছেড়ে দিয়ে বট তলায় ওরা ড্যাংগুলি খেলেছে। কোন দিন বিকেলে পানি নেমে যাওয়া গাঙ পাড়ের কালো নরম কাদা খুঁড়ে টাকি আর চিংড়ি ধরে বাড়ি ফিরেছে। নয়ত খালের পানিতে ওচা পেতে রুপোর মত চকচকে এক ঝাঁক পুঁটি আর বেলে মাছ ছোট মাটির কলসী ভরে গান গাইতে গাইতে পড়ন্ত রোদে বাড়ি ফিরছে। নাড়া দিয়ে ভাত রাঁধতে রাঁধতেই খুশী মুখে ক্ষিপ্র হাতে মায়েরা মাছ কুটে নিয়েছে। রাত্রিবেলা কুপির কাঁপা আলোয় লাল চালের ভাতের সঙ্গে কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না পুঁটির তরকারি মেখে ভাত খেতে খেতে মায়ের মুখটাকে অপূর্ব মমতাময়ী মনে হয়েছে।[৩৯]

তবে তাদের আর গ্রামে ফিরে যাওয়া হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

এক দিন জুলেখার নানী রাস্তার ধারে প্রচন্ড রোদের মধ্যে মরে পড়ে থাকে, আর জুলেখার মার মনে পড়ে এই মা-ই রাতে না খেয়ে ঘুমিয়ে গেলে তাকে তুলে রাজা বাদশার গল্প শুনিয়ে ভাত খাইয়েছে। সই-দের সাথে গাঙে নাইতে গেলে দেরি হলে গাঙের পাড়ের তাল গাছ অবধি ছুটে এসেছে, রাতে বাঁশ ঝাড়ে কটকট শব্দ হলে বা ভুতুম প্যাঁচা ডাকলে এই মায়ের বুকেই মুখ লুকিয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করেছে। তার সেই মা-ই অভাবে পরে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে আজ এই পথের ধারে মরে কুন্ডুলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

চুরির দায়ে খালেকের ছয় মাসের জেল হলে খালেকের বৌ অজিফাকে তার বাবা এসে নিয়ে গেল। ঘর ভাড়া চালাতে না পেরে এক বাড়ীতে দশ টাকা বেতনে বাধা কাজে ঢুকতে পোটলা পুঁটলি বেধে চলে গেল খালেকের মা। ফুলজানের স্বামী যক্ষা রোগে মারা যাবার পরে তারাও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হতে পারে এই ভয়ে বাড়ীওয়ালা বাড়ী থেকে বের করে দিল ফুলজানকে। টেরিকাটা বাবু ছোকরার সাথে পালিয়ে গেল স্বামী সোহাগী হাস্যময়ী ময়না, উচ্ছল মুখরা বাক পটিয়সী সুন্দরী সোনাবড়ু সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়ে, চুল পরে, সারা শরীরে থকথকে ঘা নিয়ে ফকিরচাঁদের সাহায্যে কোন রকমে বেঁচে থাকল। এর মধ্যেও সুখের ছিটেফোঁটা এসে লাগে তাদের জীবনে। আলেকজান বয়স্ক স্বামী নিয়ে মোটামুটি সুখের জীবন পায়। ট্রাকের চাপায় জুলেখার স্বামী ইদ্রিস মারা গেলেও প্রথম স্বামী জামাল আসে তাকে ফিরিয়ে নিতে। তারা স্বপ্ন দেখে গ্রামে ফিরে যাবার। এভাবেই বস্তিবাসী নারী পুরুষের ঘাম, ক্লেদ, হতাশা, স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বিন্যস্ত হয়েছে রিজিয়া রহমানের উপন্যাস 'ঘর ভাঙ্গা ঘর'।

বং থেকে বাংলা

বাঙালীর জাতি গঠনের ইতিহাসকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে রিজিয়া রহমানের বিশালায়তন উপন্যাস 'বং থেকে বাংলা'। এই উপন্যাসে রিজিয়া রহমান বাঙালীর ইতিহাসসন্ধানী এবং একই সঙ্গে সমকালস্পর্শী। শ্রম, অধ্যবসায়, ইতিহাসজ্ঞান এবং শিল্প-চেতনার অন্তরমিলনে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাস বাংলা কথা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম।[৪০]

আড়াই হাজার পূর্বে এ্যারিস্টটল বলেছিলেন, ইতিহাস হচ্ছে সত্য ঘটনার বিবরণ, আর ইতিহাস আশ্রিত সাহিত্য হচ্ছে ইতিহাসের কঙ্কালের ওপর কল্পনার ঐশ্বর্য। রিজিয়া রহমানের এই উপন্যাসে

Dhaka University Institutional Repository

আছে ইতিহাসের অস্তিকরোটিতে কল্পলোকের তনুমন। ইতিহাসের ধূসরতায় মিশেছে কল্পনার সৌরভ। এভাবেই তিনি ইতিহাসকে স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়াসে পরিণত করেছেন শিল্পে। এ বিষয়ে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য,

> বাংলাদেশের জাতি গঠন ও ভাষার বিবর্তনের উপর ভিত্তি করে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসের সৃষ্টি। আড়াই হাজার বছর আগে বং গোত্র থেকে শুরু করে উনিশ'শ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পরিব্যপ্তির মধ্যে এ উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করা হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন যুগ থেকে বিভিন্ন ঘটনা গ্রহণ করে বিধৃত করা হলেও একটি মূল কথায় এসে এর সমাপ্তি টানা হয়েছে। বাংলার সিংহাসন চিরকাল বিদেশী ক্ষমতালিপ্সু এবং সম্পদলোভীর দ্বারা শাসিত হয়েছে। কিন্তু জনগণ থেকে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। বাংলার সাধারণ মানুষ চিরকালই ছিল অবহেলিত, উপেক্ষিত ও উৎপীড়িত।.... 'বং থেকে বাংলা' যেমন একদিকে ইতিহাসের সঙ্গে সেই কথাটিই প্রকাশ করেছে তেমনি কি করে সুদীর্ঘ দিনে একটি জাতি স্বাধীনতার মর্যাদায় এসে দাঁড়িয়েছে তারই চিত্রণের চেষ্টা করেছে 'বং থেকে বাংলা'। একটি দেশ ও জাতি গঠনের ইতিহাস সাধারণ মানুষের দুঃখ বঞ্চনার হাহাকারের ইতিহাস এবং একটি জাতির জাগরণের ইতিহাস।[৪১]

একটি জাতির উদ্ভব, বিবর্তন ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ঐতিহাসিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রিজিয়া রহমানের জ্ঞানের ঋদ্ধতা, ইতিহাসবোধ, সমাজমনস্কতা ও সময়জ্ঞানের সাথে শৈল্পিক আবেগ ও সৃষ্টিশীল কল্পনার সমন্বয়ে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে বাঙালী জাতির উদ্ভবের শৈল্পিক চিত্র। সমতট ভূখন্ডের সৃষ্টি থেকে শুরু করে জীবন ও সমাজের বিকাশের ধারায় বাঙ্গালী জাতি গঠন, তার অগ্রগতির নানা পর্যায়ের দ্বন্দ্ব সংঘাত সমাজের ভিতর বাহিরের উত্থান পতন, নানা বিদেশী বণিক ও শাসকদের আগমন প্রস্থান, তাদের শোষণ নির্যাতন আবেগ উচ্ছ্বাস, বিলেতি ঔপনিবেশিক শাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও নির্যাতন নিপীড়ন এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব পর্যন্ত এ উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত।

উপন্যাসের সূচনাতেই ঔপন্যাসিক সমতট ভূমির সৃষ্টির ঐতিহাসিক বস্তুসত্যকে চিত্র ও কাব্যরীতির সংমিশ্রণে করে তুলেছেন বাঙ্ময়-

> সমুদ্র মেঘলা স্রোতস্বিনীর ধারা-স্পর্শী নীল বনাচ্ছন্ন এক ভূমি। কবে সেই সৃষ্টির আদিতে যখন তৃতীয় হিমবাহর যুগ অতীত হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমেছে সোনালী বসন্ত। তখনও কিন্তু জন্মলগ্নের

Dhaka University Institutional Repository

আলোড়ন হিমালয়ের পূর্ব-দক্ষিণ সীমানায়। সেই জন্মলগ্নের বেদনা আনন্দের মধ্য দিয়ে নীল জলধির বুক চিরে দেবী ভেনাসের মতো জেগে উঠেছিল এই ভূখণ্ড। পাষাণ পর্বতের অন্তঃস্থল থেকে সে পরোধর সদৃশ স্নিগ্ধ ধারা কিশোরীর চঞ্চলতার নৃত্যছন্দে স্বচ্ছ শরীরে ঘর ছেড়েছিল, সেই ক্ষীণাঙ্গী ধারাই পূর্ণযৌবনা হয়ে জন্ম দিল এক সুবর্ণ পলিখণ্ড– সমতট।[৪২]

উত্তরের দ্রাবিড় ভূমিতে আর্যদের আক্রমণে দ্রাবিড়রা হল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। এদেরই দুজন নর-নারী বং-এলা ভাসতে ভাসতে উঠলো সমতটে। আর সমতটের আদি বাসিন্দা বাইদ্যা, পাইক্কী, কিয়াত্দের নিয়ে গড়ে উঠলো বং গোত্র। অনুমান করা হয় প্রায় তিন হাজার বছর আগে আদিম সমতট ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দ্রাবিড় বং গোত্র ও অষ্ট্রো-এশিয়াটিক অন্যান্য বিভিন্ন অর্ধ-সভ্য মানুষের বসতি ছিল। ঐতিহাসিক এই তথ্যের উপর রিজিয়া রহমান সংযুক্ত করলেন রক্ত-মাংসের বং-এলার মানবিক স্পর্শে গড়ে ওঠা বঙ্গাল জনপদের কাহিনী। এর পর হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় কিরাত বণিক সমসিন, বাইদ্যা, বুইনী আর বঙ্গাল কালু, ভিখুরা প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে গড়ে তুলল কৃষি ও বাণিজ্যভিত্তিক জনপদ। আর্যরা আর্যাবর্তের বাইরে দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়-জল বেষ্টিত অঞ্চলে আসতে বিশেষ সুবিধা করতে পারে না এর প্রাকৃতিক দুর্গমতার জন্য। তাছাড়া ব্রাহ্মণকুল বিধান- ঐ ম্লেছ দেশে গেলে ব্রাহ্মণকুলের ধর্ম নষ্ট হয়।

তবু এক সময় এ অঞ্চলের সম্পদের লোভে আর্য যোদ্ধা মহাবীর ভীম আক্রমণ করে ধন সম্পদ আর কৃষ্ণাঙ্গিনী ললনাদের লুণ্ঠন করে ফিরে যান আর্যাবর্তে। কিন্তু কিছু সংখ্যক আর্য সৈন্য রয়ে গেল পুন্ড্র, গৌড় আর সমতটে। এরকম একজন নীলেন্দ্র, বঙ্গাল বিনিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধল এই বঙ্গাল জনপদে। এভাবেই দ্রাবিড় বঙ্গাল বাইদ্যা কিরাত এর সাথে মিশ্রিত হল আর্য রক্ত। গুপ্ত শাসনামলে রাঢ়, গৌড়, পুন্ড্র গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হল। সমতট জয় করলেও তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পুরোপুরি অধীন করা যায় নি এই অঞ্চলকে। তবে এ সময় থেকেই পেশী শক্তি, রাজশক্তি ও ধর্মশক্তির অভ্যুদয় ঘটে। আর্যশক্তির বিস্তৃতির কালে এই শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ অবস্থানের সৃষ্টি হয়। কখনও এদের মিলিত শক্তির আঘাতে বিপর্যস্ত হয় আর্যাবর্তের বিপুল সাধারণ মানুষের জীবন। গুপ্ত শাসকরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হলেও বৌদ্ধ, নিগ্রন্থ ও শৈব বিষ্ণুধর্ম সম্পর্কে উদারতা দেখালেও রাজ সৈন্য দ্বারা বাঙ্গাল বলে কারাবন্দী নীলেন্দ্রের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যোপলব্ধি হচ্ছে-

যুগ যুগ ধরে এমনি করে অস্ত্রের শক্তি আর ধর্মের শক্তির প্রতিযোগিতা চলছে। আর শেষ পর্যন্ত ধর্মশক্তি অস্ত্রশক্তির কাছে মাথা নত করছে। ..... প্রকৃত নিগ্রন্থ অহিংসার ধ্বজাবাহী

Dhaka University Institutional Repository

> হয়েও দাস ক্রয় করে, শরীরে জোঁক লাগিয়ে দাসের রক্ত পান করায়। একেই বলে তারা জীবে দয়া। বৌদ্ধ সংঘগুলোতে ভিক্ষুরা বৈরাগ্যের নামে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রতি লোলুপ হয়ে উঠছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বেদের মনগড়া প্রচার দ্বারা মানুষের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতায় ভয়াবহ। সত্য যুগে যুগে ঠিকই আসে। মানুষই তাকে বিকৃত করে জটিল করে তোলে। ফলে মানুষের মুক্তি শান্তি কিছুই লাভ হয় না। বরং এই বিকৃত মতবাদ রাজরাজাদের হাতের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। আর হয় সাধারণ মানুষকে নিপীড়ন করবার সহজ পন্থা।[৪৩]

নীলেন্দ্রভদ্রেরই উত্তর পুরুষ শীলভদ্র–

> বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ পরিবারের রক্তধারা শিরা-উপশিরায় প্রবহমান থাকা সত্ত্বেও একজন বিদগ্ধ বঙ্গাল ভিক্ষুরূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে জ্ঞান-বিতরণে নিজেকে বিলীন করে দিল।[৪৪]

বৌদ্ধ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বে বৌদ্ধ সংঘারামের মেলায় আর্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরা স্ত্রী পুত্র নিয়ে আনন্দ উৎসবে অংশ নেয়। কিন্তু সে উৎসবে অংশ নিতে পারে না নিম্নবিত্ত শ্রেণীর, ডোম শ্রেণীর আর্যরা। শবর বালিকা চম্পার বেদনার মধ্য দিয়ে এই সত্য ফুঁটিয়ে তুলেছেন রিজিয়া রহমান।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরে গৌড়াধিপতি গোড়া শিব শশাঙ্ক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিভ্রমণ নিষিদ্ধ করলেন। তার আমলে বৌদ্ধদের উপর নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে বৌদ্ধ বালক ভিখুর জবানিতে-

> আমার ছায়াটা ব্রাহ্মণের পায়ে পড়েছিল। তাই রাজার রক্ষীরা মারতে মারতে আমার পা ভেঙ্গে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ তো বলছিল আমার ছায়াটা নাকি পাপ।[৪৫]

পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সমতটের মানুষ রাজাদের অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে একসময় নিজেদের নির্বাচিত গোপালকে রাজার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। পত্তন হয়েছে পাল সাম্রাজ্যের। বৌদ্ধ পাল রাজারা শিল্প, শাস্ত্র, জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি করলেও জাতিভেদের কঠোরতা দূর করতে পারে নি।

> ...দুঃখী ডোম শবর চন্ডালরা ঘৃণিত অর্ধভূক্ত অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে এককোণে।.....বৌদ্ধ রাজারা বিরাট বৌদ্ধ সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সোনা-রূপা-হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের চোখ ধাঁধানোর যে সৌধ নির্মাণ করছে তা ধর্ম রক্ষার জন্য নয়, নিজেদের কীর্তিকে অমর করবার জন্যে। ওই ধনীর সৃষ্ট ধর্মালয় সহজ মানুষের জন্য নয়। এতে আসক্তি, মুক্তি নয়।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

পাল রাজা মহীপালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ কৈবর্তরা দিব্যকের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ করে তাতেই ভূলুণ্ঠিত হয় ক্ষমতাগর্বিত পাল রাজার স্বর্ণমুকুট। কিন্তু আবার বিদেশী সম্পদলোভী দস্যুদের হাতে স্বাধীন সমতট বঙ্গাল পদানত হল। পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ ভোজবর্মন হলেন বঙ্গালের রাজা। এ সময় আরব থেকে দুচারজন মুসলমানের আগমন ঘটল এ অঞ্চলে।

সেন রাজাদের শোষণ নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও দ্রোহের প্রকাশ ঘটল ঈশান মল্ল চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সেন রাজাদের ঈশান মল্ল ভয় পায় না।

> আমরা স্বাধীন, আজ থেকে আমরা কারো অধীন নই। এই বঙ্গাল আমাদের।[৪৭]

এ অঞ্চলে তুর্কীদের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন সেন রাজারাই। ভজহরি আর কমলের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তারই স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

> লক্ষণ সেনের বাবা বল্লাল সেন যদি কৌলিণ্য প্রথা চালু না করত তাহলে আজ তুর্কীরা রাঢ়, গৌড় দখল করে বসতে পারত না। তাছাড়া সত্যিই কি ব্রাহ্মণরা ধর্ম রক্ষা করেছে? তারা তো বল্লাল সেনের দেয়া কৌলিণ্যের গর্বে কে কত বড় কুলীন আর শাস্ত্রচর্চায় কার কতখানি পান্ডিত্য সেই রেষারেষির লড়াইতে অন্ধ।[৪৮]

অন্য দিকে ইসলাম গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ কমল আর কৈবর্ত মহলী মিলিত জীবন শুরু করল। অত্যাচারী শাসকদের হটিয়ে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সিংহাসনে বসলে পাল্টে গেল শাসনব্যবস্থা। বাঙালা হলো ফারসীর পাশাপাশি রাজভাষা। সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানেরচর্চায় আলোকিত হলো হোসেন শাহ'র বঙ্গাল। আফগানিস্তানের পাখতুন হায়াত মাহমুদ আর বেদেনী রূপসীর প্রেম কাহিনী আপ্লুত করল বাঙ্গালদের মন। আর এর মধ্যেই প্রেমরসের বাণী নিয়ে এলেন শ্রী গৌরাঙ্গ তথা নিমাই। ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় বাঙালীর জীবনে যে ইতিবাচক চেতনা সৃষ্টি করেছিল তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে।

চিরকাল এদেশের সম্পদ যেমন বিদেশীদের লোলুপ করেছে তেমনি লুব্ধ হয়ে তারাও ছুটে এসেছে। এসেছে রাজ্য জয় করতে, ধন সম্পদ কুক্ষিগত করতে। সিলভেরিয়া কাব্রিওর মর্মন্তুদ জীবন পরিণতির পিছনেও আছে পর্তুগীজদের সম্পদ লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ আগমনের পরবর্তী ঘটনাবলী দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করেছেন রিজিয়া রহমান। নীলকরদের বিরুদ্ধে হারাধন, অসিমদ্দি আর সাইদের বিদ্রোহ আর নিষ্ঠুরতার সাথে তাদের দমন, ফার্লং, রেনীদের স্বেচ্ছাচারী জীবন, একজন বারবারার মানবিক লড়াই– এ কাহিনীতেই সম্পন্ন হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কাল। আর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও মুক্তিযুদ্ধকালীন আবেগ চেতনাও সমগ্রতায় রূপায়িত হয়নি।

সম্পদের লোভে বারবার এদেশের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে আর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, তুর্কী, হাবসী, পাঠান, মোঘল, পর্তুগীজ, ফরাসী আর ইংরেজদের। নির্বিচার লুণ্ঠন আর অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়েছে এদেশের মাটি আর মানুষ। তবু কৈবর্ত দিব্যক, বঙ্গাল ইশান মল্ল, নীলবিদ্রোহী হারাধন, মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুদের মধ্য দিয়ে আন্তরিক দ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে। আর এই দ্রোহের মধ্য দিয়েই হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ।

রক্তের অক্ষর

১৯৭৮ সালে রচিত রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' উপন্যাস বাংলাদেশের উপন্যাসের জগতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন আছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর নগর জীবনের নিষিদ্ধ পল্লীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পাশবিক, যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র, তেমনি অন্যদিকে বীরাঙ্গনা ইয়াসমিনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের স্বপ্নভঙ্গজাত হতাশা, নিরাশা, সমাজ জীবনের অন্তর্গত ক্ষত, অসংগতি, লাম্পট্য, ক্লেদ, গ্লানি উন্মোচিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

কুসুম, বকুল, শান্তি, সখিনা, জরিনা, পারুল, পিরু, মমতা, ফুলমতিরা এই নিষিদ্ধ পল্লীর বাসিন্দা। আর আছে গোলাপজান, রহিমন, ময়না। এককালে তারাও এই দেহব্যবসাতেই ছিল। বেশ্যাপল্লীর খারাপ রোগে রহিমনের নাকের মাংশ খসে গেছে, সেই ক্ষত দিয়ে রস ঝরে। বেশীর ভাগ দিন ভিক্ষায় সামান্য যে পয়সা পায় তা দিয়ে ভাত-রুটি কিনে না ও, তাড়ি কিনে খায়। নেশা বাড়লে দুনিয়াশুদ্ধ লোককে গালাগালি করে। গোলাপজান এখন সারা রাত অন্যের ঘরের দরজায় শুয়ে থাকে। সকালবেলা হামাগুড়ি দিয়ে খোলা দরজাগুলির সামনে গিয়ে সাহায্য চায়। যাদের ব্যবসা ভাল তাদের নানা ফুটফরমাস খেটে পেট চালায় ময়না। এই পল্লীর মাসী, যে মালিকের হয়ে ভাড়া তোলে এবং মেয়েদের তত্ত্বাবধান করে সেও একসময় দেহব্যবসাই করতো। দশ বছর বয়েসে বিধবা হয়

Dhaka University Institutional Repository

মাসী তথা সীতা। যৌবনে বড় বোনের স্বামীর নজরে পড়ে জেগে উঠে তার ভিতরের মানুষটি। এক সময় নীচুঘরের এক ছেলের সাথে পালিয়ে যায় সে। সে ছেলে তাকে ফেলে চলে গেলে সীতা এসে উঠে এ পাড়ায়। এভাবেই এখানের প্রত্যেকটি মেয়েরই একটা করে গল্প আছে।

বারো বছরের পিরু নদী ভাঙ্গনে বাবা মার সাথে ঢাকার বস্তিতে এসে উঠে। বাবা, মা কাজে গেলে ছোট ভাইবোনদের দেখে রাখত সে। একদিন লম্পট এক লোক তাকে মায়ের দুর্ঘটনার মিথ্যে কথা বলে এনে বিক্রি করে এখানের হীরুর কাছে। পিরু প্রত্যেক দিন কাঁদে আর স্বপ্ন দেখে গ্রামে ফিরে যাবার। হীরুর নিষ্ঠুর মারের পর চারজন খরিদ্দার নিতে হয়েছে পিরুকে। পাঁজর সর্বস্ব পিরুর দেহটাকে তারা বুভুক্ষু জন্তুর মতো ছিড়ে খুঁড়ে খেয়েছে। একজনের নিষ্ঠুর দাঁতের কামড়ে পিরুর গলার মাংস উঠে গেছে। পিরু আর পারে না। পিরু মরে যেতে চায়। কিন্তু তবুও বেঁচে থাকে এই নিষ্ঠুর রাতের অভিজ্ঞতা নিয়ে। দিনের বেলা সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে গল্পও করে সে।

পারুল অভাব আর সৎমার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই যেদিন সৎমা তাকে এখানে বিক্রি করে দিয়ে গেল পারুলের কোন আক্ষেপ হয় নি সেদিন। বরং স্বপ্ন দেখে একদিন গায়ে গতরে বড় হয়ে উঠবে সে। জাহানারার মত বেশ্যা হবে, গাড়ীওয়ালা খদ্দের হবে তার।

এভাবেই কেউ নায়িকা হতে এসে, কেউ স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে ভাইয়ের সংসারে টিকতে না পেরে, কেউ একাত্তরে রাজাকারদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে, কেউ নদী ভাঙ্গনে বন্যায় উদ্বাস্তু হয়ে রিলিফ নিতে এসে দুর্বিপাকে পড়ে এখানে এসে উঠেছে। সখিনা এখানেই দীর্ঘদিন ধরে আছে তার মা, নানীও এখানে ব্যবসা করতো, তার সন্তানরাও এখানেই থাকবে। মেয়ে হলে হবে সখিনা আর ছেলে হলে হবে কাঞ্চন, হীরু ও কালু। এখানে চার হাত আট হাতি, ইঁট বের হয়ে থাকা, ছাঁদ দিয়ে পানি পরা ঘরে ওরা তিন চারজন করে থাকে। ঘরের মধ্যেই রান্নাবান্নার, সাজগোজের, কাপড় চোপড়ের সরঞ্জামাদি।

একই ঘরে একই পুরনো পায়া নড়বড়ে চৌকিতে জরিনা, শান্তি, কুসুম, ভাগে ব্যবসা করে। সংকট প্রায়ই দেখা দেয়। একসঙ্গে সবার খদ্দের এসে গেলেই সমস্যা। প্রথমজনকে আগে ঢুকবার অধিকার দিয়ে বাকি দুজন বাইরে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ঘর খালি করবার তাগাদা দিতে থাকে। আর সস্তা রং তামাশার ইয়ার্কি দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে খরিদ্দারকে আটকে রাখে। একটাই বারোয়ারী পায়খানা, সকলে রেশনের মত লাইন ধরে সেখানে। সবুজ জমাট বদ্ধ পচা পানির কুয়োতলায় সকাল বেলাতেই

Dhaka University Institutional Repository

পানির হাড়ি কলসী বালতি জমে। যাদের ভাল ব্যবসা আছে তারা মাসীকে দিয়ে বড় রাস্তার কল থেকে পয়সা দিয়ে পানি আনিয়ে মুখ ধোয়, গোসল করে।

বকুল, কুসুম, পিরুরা স্বাধীন ব্যবসায়ী নয়। তাদের কালু বা হীরুরা কিনে এনে ঘর ভাড়া করে রাখে। তাই তাদের খদ্দেরের টাকাও নিয়ে যায় কালু, হীরুরা। খদ্দের এলেই শুধু ডাল ভাতের ব্যবস্থা হয় তাদের। আর খদ্দের বসাতে না পারলে, ঘর ভাড়ার টাকা না উঠলে, কালু বা হীরুরা চড় লাথিতে শ্রান্ত করে ফেলে তাদের ছোট শরীরটাকে। এই নিষিদ্ধ পল্লীতে এলেই বোঝা যায় পুরুষের রুচির কত রকম ভেদ আর বিকৃতি আছে।

> বকুল এক মানুষ নিছিল বিশ ট্যাকায়। দশ ট্যাকার বকুল বিশ ট্যাকা পাইয়া নাচতে নাচতে ব্যাডারে লইয়া ঘরে দুয়ার দিছে। ব্যাডা বলে আর কিছু করবার চায় নাই। পকেটে হামলাইয়া একটা লিকলিকা চাবুক আনছিল। বকুলেরে উদাম কইরা সারা গতরে চাবুকের বাড়ি বহাইয়া রাখে নাই কিছু। ....ছেড়ির চিল্লানিতে শান্তি, জরি, সবটিতে যাইয়া দরজা ভাইঙ্গা ভিতরে ঢুইকা দেহে বকুলের সারাটা শরীর ফালা ফালা হইয়া গেছে। ব্যাটা এই ফাঁকে পালাইছে।[৪৯]

এই ঘটনার পর বেদনার্ত বকুল ইয়াসমিনকে প্রশ্ন করে,

> বুয়া গো। হারামির পুতেরা আমাগো কি মানুষ মনে করে না? আমাগো কি মানুষের শরীর না?[৫০]

এ পাড়ারই জাহানারা সবচেয়ে অবস্থাপন্ন বেশ্যা। সে দোতলায় একটা ঘরে একাই থাকে। সে খদ্দেরের জন্য রাস্তায় দাঁড়ায় না। ময়না আর কাঞ্চন তার খদ্দের জোগাড় করে। গাড়ীওয়ালা খদ্দেরও আছে তার। এই জাহানারার মাথা ধরার একটা অদ্ভূত রোগ আছে। জাহানারা তখন অন্য রকম হয়ে যায়। চিৎকার করে বালিশ কাঁথা ছুড়ে ফেলে, বোতল আছড়ে ভাঙে। অশ্লীল গালা গাল করতে থাকে পৃথিবীশুদ্ধ সবাইকে। একসময় জাহানারাও আক্রান্ত হয়ে এই পল্লীর সেই ভয়ানক রোগে।

এই নিষিদ্ধ পল্লীর একেবারে আলাদা মানুষ ইয়াসমিন। একাত্তরে ভাইয়ের বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা কামালকে আশ্রয় দেয়ার কারণে পাক বাহিনী হানা দেয় তাদের বাড়ীতে। সবাইকে মেরে ধরে নিয়ে যায় ইয়াসমিনকে। দীর্ঘ অত্যাচার সয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে আসে সে। ঠাঁই নেয় আশ্রয় কেন্দ্রে। আত্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

স্বজন কেউ খোঁজ নিতে আসেনি তার। একদিন নিজেই গিয়েছিল চাচার বাসায়। চাচা-চাচী তাকে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছেন। অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলেছেন,

> কেন যে তোর বাবা সেই ছোকরাকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছিল।[৫১]

ইয়াসমিন রাগে দুঃখে চিৎকার করে বলেছিল–

> কেন খুব অন্যায় হয়েছিল বুঝি? ওদের মতো ছেলেরা যুদ্ধ করেছে বলে, আমার মত মেয়েদের ইজ্জত খোয়া গেছে বলেই তোমার মত লোকেরা স্বাধীন দেশে এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে।[৫২]

চাকুরী জোগাড় করতে গিয়েও ধাক্কা খেয়েছে সে। ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের আচরণে তড়িতাহত হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে,

> এই যে এখানে আরো তো মেয়ে এসেছে চাকরির জন্য, এর মধ্যে আমার সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহের চেয়ে কৌতুহল বেশি। কারণ আমি সরকারের দেয়া বীরাঙ্গনা খেতাব নিয়ে এসেছি। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি বলে দিচ্ছে যে আমি সমাজ ছাড়া মেয়ে। সরকার বোধ হয় বারাঙ্গনা বলতে ভুলে বীরাঙ্গনা খেতাব দিয়ে ফেলেছে।[৫৩]

যুদ্ধের আগে ইয়াসমিন আর তারেক একই রাজনৈতিক সংগঠন করতো, একসাথে ঘুরে বেড়াত। তারেকও গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। তারেক বিয়ে করেছে। ইয়াসমিনের কথা শুনে তার জন্য দুঃখ করেছে, ওর বিয়ের ব্যবস্থার কথা বলেছে, এই পর্যন্ত। এক সময় ইয়াসমিন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সুস্থ হতে হতে মুক্তিযোদ্ধা আর বীরাঙ্গনাদের নিয়ে উত্তেজনা কমে আসে। একদিন দুস্থ নারী কেন্দ্র থেকে একজন ইয়াসমিনকে বিয়ে করে নিয়ে যায়। সেই বিয়ের খবর ফলাও করে ছাপা হয় পত্র পত্রিকায়। কিন্তু এক সময় স্বামী নামক সেই লোক ইয়াসমিনদের বাড়ী দখল মুক্ত করে তাকে দিয়ে বিক্রি করায়, তারপর ধরে নিজ মূর্তি। ইয়াসমিনের গলায় জোর করে সে মদ ঢালে। বন্ধু বান্ধব নিয়ে এসে সারা রাত ধরে বিয়ে করা বউকে নিয়ে যৌথভাবে ফুর্তি করে। ইয়াসমিন বাধা দিলে ব্যঙ্গ করে বলে,

> পাঞ্জাবী ব্যাটাদের সাথে যদি শুতে পারো তবে এসব পারবে না কেন? ইয়াসমিনের দেহের বদলে লোকটা বড় বড় কন্ট্রাক্ট কিনে দেদার পয়সা লুটেছে।[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

চাচা, মামাদের কাছে গিয়েছিল ইয়াসমিন। তারা উল্টো সমাজের দোহাই দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাকে। প্রচন্ড অভিমান, জ্বালা আর ক্ষোভে একসময় তার মনে হলো–

> যুদ্ধ যদি আমাকে বেশ্যাই বানাল, তবে তার ফল ভোগ ঐ ক্রীম খাওয়া লোকদের করতে দিব না। আমি বেশ্যা হয়েই যাব।[৫৫]

তারপরেই ইয়াসমিন উঠে এসেছিল এই নিষিদ্ধ পল্লীতে। একদিন এই পতিতা পল্লীতেই আসে যুদ্ধের সময় ইয়াসমিনদের বাসায় আশ্রয় নেওয়া মুক্তিযোদ্ধা কামাল। যাকে আশ্রয় দেয়ার কারণেই আজ ইয়াসমিনের পরিবারের সবাই মৃত, সে বেশ্যা। কামালকে দেখে রাগে দুঃখে তার মাথায় কাঁচের বোতল ছুড়ে মারে ইয়াসমিন। বেদনার্ত কণ্ঠে কামাল বলে,

> তোমার অবস্থার মূলে যদি আমি থেকে থাকি তা তুচ্ছ হয়ে গেছে সমাজের অবিচারে। যে সমাজ তোমাকে সহজ করে নিতে পারি নি, সেই সমাজেরই একটি অংশ আমাদের মতো হতাশ ছেলেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের পথে। আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি আত্মধ্বংসের মধ্য দিয়ে।[৫৬]

যুদ্ধোত্তর সমাজের অধঃপতন আর চরম হতাশাই চিত্রিত করেছেন রিজিয়া রহমান কামাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

এই পতিতা পল্লীতে ইয়াসমিনের আগমনে একটি নতুন জীবন চেতনার উন্মেষ ঘটে। সে এই পতিতা পল্লীর মেয়েদের মধ্যে মনুষ্যত্বের, অধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তৈরী করতে চায়। সে রাশিয়া, চীনের বিপ্লবের গল্প শোনায়। কিভাবে বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া, চীনে এই সব মেয়েদের জীবন পাল্টে গিয়েছিল সে কথা বলে। তাদের সামনে এক স্বপ্নের জগত নির্মাণের চেষ্টা করে। এক সময় এই মেয়েরা ইয়াসমিনের সাথেই হীরুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কিন্তু হীরুর হাতে ইয়াসমিনের মর্মান্তিক মৃত্যু পুরুষশাসিত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীর বিপন্ন অস্তিত্বকেই কেবল নির্দেশ করে না, একটি জাতির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গজনিত ট্রাজেডির স্বরূপও উন্মোচিত করে।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। দিলারা হাশেম, ঘর মন জানালা (মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮০), পৃ.১৮১

২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮

৩। পূর্বোক্ত, ৩১৯

৪। দিলারা হাশেম,*একদা এবং অনন্ত* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৯৭), পৃ. ৪০

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪২

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

১০। ঐ

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

১৮। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৯। দিলারা হাশেম, *আমলকীর মৌ* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ১৯৯৯), পৃ. ১৯৮

২০। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬

২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

২২। ঐ

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *যোগাযোগ* (রিফাত পাবলিকেশনস, ঢাকা), পৃ. ১২৬

২৬। দিলারা হাশেম, *আমলকীর মৌ* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ১৯৯৯), ৩০-৩১

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪

২৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

৩০। ঐ

৩১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

৩৬। রিজিয়া রহমান, *ঘর ভাঙা ঘর* (মৃদুলা প্রকাশন, ঢাকা; ২০০৭), পৃ. ৯

৩৭। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৪০। বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯১), পৃ. ৪৬

৪১। রিজিয়া রহমান, *বং থেকে বাংলা* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; ২০০০), পৃ. ১৬

৪২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৪৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

৪৯। রিজিয়া রহমান, *রক্তের অক্ষর* (সাহিত্য বিলাস, ঢাকা; ২০০৩), পৃ. ২৮

৫০। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৫১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৫২। ঐ

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

৫৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৫৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৫৭। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস- বিষয় ও শিল্পরূপ* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৭), পৃ. ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনা (১৯৮১-১৯৯০)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১ থেকে ১৯৯০ এই এক দশকে সামরিক শাসন বাংলাদেশের জনজীবনকে করলো বিপর্যস্ত। লুণ্ঠন শোষণের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদশালী মানুষেরা সমাজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলো। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেল। গ্রামের ভূমিহীন মানুষ শহরমুখো হল। প্রতিকূল সমাজ কাঠামোতে মানুষের প্রতিবাদ, দ্রোহ, সংগ্রাম মুখ্যত ব্যর্থতামুখী হলেও প্রাগ্রসর চেতনা সমৃদ্ধ ঔপন্যাসিকেরা মানবীয় জাগরণের প্রতীকী সত্যকে উপন্যাসে রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন কখনো কখনো।

এই সময়ে মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো- রাবেয়া খাতুনের বায়ান্ন গলির এক গলি (১৯৮৪), নীল নিশীথ (১৯৮৩), ই বাদর মাহ ভাদর (১৯৮৮); রিজিয়া রহমানের সূর্য সবুজ রক্ত (১৯৮১), একাল চিরকাল (১৯৮৪), একটি ফুলের জন্য (১৯৮৬); সেলিনা হোসেনের যাপিত জীবন (১৯৮১), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩), পদশব্দ (১৯৮২), চাঁদবেনে (১৯৮৪), পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬), নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি (১৯৮৭), কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯); রাজিয়া খানের হে মহা জীবন (১৯৮৩)।

রাবেয়া খাতুন

বায়ান্ন গলির এক গলি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিশ্ববাস্তবতা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগকালীন এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জটিল বিন্যাসের পটভূমিতে পুরান ঢাকার একটি মহল্লার সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তনের ও ভাঙ্গনের সুরই চিত্রিত হয়েছে রাবেয়া খাতুনের উপন্যাস 'বায়ান্ন গলির এক গলি'তে। যুদ্ধের ডামাডোল বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা, হতাশা, তারই প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির উত্তেজনা, এর ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক ভয়ঙ্কর দাঙ্গার রূপায়ণ উপন্যাসের পরিসরকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছে। তবে এই রাজনৈতিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দূরাগত ঢেউ এর মত উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে জীবনসংলগ্ন হয়ে উঠেনি।

উপন্যাসের শুরুর দিকেই দেখা যায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মানুষ বৃটিশদের বিরুদ্ধে হিটলারের জার্মানির জয়ে উল্লসিত হয়েছে–

Dhaka University Institutional Repository

> যে রাজার সীমানায় সূর্য অস্ত যায় না, মারতে মারতে তাদেরই নাকি কোণঠাসা করে নিয়ে এসেছে জবরদস্ত জার্মান দুষমনরা ।[১]

উনিশ'শ তেতাল্লিশ থেকে উনিশ'শ সাতচল্লিশ পর্যন্ত উপন্যাসের ঘটনাক্রম সংগঠিত হয়েছে। এই সময়ে যে সামন্ত জীবনাশ্রয়ী কিন্তু উদার মানবতাবাদী বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিধান্বিত বিকাশ ঘটছিল তারই প্রতিনিধি এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র পুরনো ঢাকায় মেকাইল এন্ড সন্স এর মালিক মেকাইল সর্দার। দেশ বিভাগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের জটিল জীবনবাস্তবতা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে এ উপন্যাসের ঘটনাংশ। উপন্যাস বিধৃত চরিত্রগুলোর জীবনাচরণ ও উচ্চারণের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মন্দার প্রভাবে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তজীবনাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাঙ্গনের সুর ও দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষের চিত্র।

যুদ্ধে সৃষ্ট মন্দার প্রভাবে দেখা দিয়েছে দুই গোলার্ধে ধ্বংসের তান্ডব। বাংলাদেশের মানচিত্রে ক্ষুধার লেলিহান নৃত্য। ছোট্ট শহর ঢাকায় নিত্য নতুন সমস্যা।

> ....কাছাকাছি গ্রাম থেকে পিল পিল করে মানুষ আসছে। ..... দিন দিন জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। .....এখন পালন কর্তার বেগতিক অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে বেলেহাজ বেজেহানী রায়ত। ভাই বেরাদরদের হাতে না মেরে ভাতে মারছে। মতলব আখের গোছানোর।..... মানুষ মরছে কাতারে কাতার। তাদের লাশ তুলে নেওয়া, কবর দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে না সময় মতো। আলা সর্দার এই মুর্দাদের বহন করার জন্য নিজ ব্যয়ে দুটি ঘোড়ার গাড়ীর ইন্তেজাম করেছেন। কাফনের খর্চা। মৃতপ্রায়দের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি বেড। জীবিতদের জন্য মহল্লায় চালু হলো লঙ্গরখানা। শোনা গেল ক্ষুধার্তদের ভাগেও কারা নাকি কারচুপি করে মাল সরাচ্ছে। এ যে লাশের শরীর থেকে কাফন চুরির চেয়েও জঘন্য অপরাধ।[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশ বিভাগকালীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারই রূপায়ণ ঘটেছে এ উপন্যাসে। উপরন্তু দেশ বিভাগজনিত জটিল-কুটিল রাজনৈতিক বিন্যাস বিপর্যস্ত করে তোলে সেকালের ঢাকাকেন্দ্রীক নাগরিক জীবনকে। ইংরেজ হটাও স্লোগানে একাট্টা হয় সকলে, কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে আবার ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের স্বতন্ত্র দুই শিবির– রাজনীতির এই জটিল পথ ধরেই বার বার সংগঠিত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রাবেয়া খাতুন এই দাঙ্গার ভয়াল দিকটি উপস্থাপন করেছেন উপন্যাসে-

Dhaka University Institutional Repository

> উদ্বাস্তু শিবিরের করুণতম অবস্থা। থকথকে কাদার মধ্যে শিশুরা গড়াচ্ছে। বৃদ্ধরা আহাজারী করছে আকাশের দিকে মুখ করে। একটি দড়ির খাটিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে গোঙ্গাচ্ছে এক যুবতী। সমতল বুকে ব্যান্ডেজ বাধা। ওর প্রৌঢ়া জননী জানালো ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুক দুটো কেটে নেওয়া হয়েছিলো। হতভাগী তবু বেঁচে আছে।[৩]

অন্যদিকে মুসলমানদের পৃথক ভূমি পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষণে দলে দলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যখন দেশ ছেড়ে যাচ্ছে তখন দীর্ঘ দিনের সুহৃদ এই মানুষগুলোর উপর অত্যাচার আর বিদায়েও মহল্লাবাসীর বিষন্ন উদাস চিত্র অঙ্কিত হয়েছে মিকাইল সর্দারের ভাবনার মধ্য দিয়ে।

> প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতেও মন কখন বিষন্ন উদাস হয়ে আসে। একজন মধ্যবয়সী লোক গরুর দুধ দোয়াচ্ছিল আর কাঁদছিল। ঐ গরুটা ছাড়া বিষয় আসয় আর কিছু সঙ্গে আনতে পারেনি সে। কি জানি কি নাম, কোন্ ধামের লোক। কিন্তু ওর মধ্যে এককার হয়ে গ্যাছে কখন দীনু গোয়ালা। চান মিয়ার জন্মের পর থেকে নিয়মিত দুধ দিতো। কবে থেকে সুখে দুখে পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলো। ওর সঙ্গে শেষ দেখাটা কি ভয়ঙ্কর, দুটি ছেলে দীনুর দুটি পা ও হাত ধরে চ্যাংদোলা অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। মাথাটা ঝুলছে শূন্যে। চোখ দুটো খোলা। ভীষণ ভয়ে মণি দুটো ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাইছে।..... জুম্মা নামাজ পড়তে এসে যখন দেখলেন ননী মুদি ফেরেনি। বাদশা মিয়ার কাছে সব বিক্রি করে দিয়ে কবে নিঃশব্দে পাড়া ছেড়ে চলে গ্যাছে, তখন চৈতন্যের দেয়ালে ধাক্কা অনুভব করেছেন। গোপী লাল পরামানিকের জায়গায় ক্ষুর কাচির লম্বা কাঠের বাক্স নিয়ে বসে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে নকীবুল্লাহ, তাও যেন কেমন কেমন লাগে।[৪]

এই দাঙ্গার তরঙ্গ ঢাকার মহল্লা জীবনেও আঘাত করে। মহল্লার পতিতাপল্লীর নারীকে নিয়ে ব্যক্তিগত বিরোধকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রং দেয়ার অপচেষ্টা হয়। এই বিরোধেই প্রাণ হারায় মেকাইল সর্দারের ছেলে সুরুজ মিয়া। এই শোকের মধ্যেও মেকাইল সর্দারের স্থির বিবেচনাবোধ আরেকটি দাঙ্গা থেকে বাঁচিয়ে দেয় মহল্লাবাসীকে। মেকাইল সর্দার পুরনো অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি। পৈতৃক চামড়ার ব্যবসা ছেড়ে এখন সিঙ্গাপুরী লুঙ্গীর ব্যবসা করেন। উদারতা ও উচ্চ মানবিকবোধ তার চরিত্রকে একটা সবলতা দান করেছে। কোমরে ব্যথা বলে স্ত্রী মেহেরজান দ্বিতল বাড়ির উপরের ঘর ছেড়ে নীচের ঘরে একা নেমে আসতে চাইলে মেকাইল সর্দার রসিকতা করে বলেছিলেন,

> ছুরুজ মিয়ার মা, মোল্‌বী ছাবে তোমার লগে যখন আমার কলমা পড়ায় তখন তুমার উমর আছিল ছাড়ে ছয়। দুধ দাঁত বি পড়ে নাইক্কা। মাগর আমার বদনে তখন হাল্কা পল্‌কা

Dhaka University Institutional Repository

> ছবজা রং-এর দাড়ি মোচ। তুমার ইয়াদ না থাকলেও আমার আছে। আল্লারে ছাক্ষি রাইখা ময়-মুরুব্বিগো জবান দিছিলাম, তুমার ছুক দুখ অখন থন আমারও ছুক দুখ। তিন কাল গিয়া এই এক কালে আইছা হেই কথাটা ভুলি ক্যামনে।[৫]

গ্রাম থেকে আসা এক অল্পবয়সী গৃহবধু মেয়ে ব্যবসাদারের হাতে পড়লে ঘটনাচক্রে তিনি তাকে উদ্ধার করেন। পরবর্তীকালে সেই মেয়ে যাতে নির্বিঘ্নে ঘর সংসার করতে পারে তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত খবরাখবর নিয়েছেন। বড় ভাইয়ের ছেলে ইলিয়াস পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে যখন মোক্তারীতে ঢুকতে চেয়েছে– তখনও সময়ের এ দাবিকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন। দেশ বিভাগকালীন উদ্বাস্তু মানুষের বহর আর তাদের উপর ভয়ানক নির্যাতনের চিত্র দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বিক্ষিপ্ত চিন্তায় বিপর্যস্ত হয়েছেন।

ইলিয়াসের স্ত্রী রওশন এই উপন্যাসের আরেকটি শক্তিশালী চরিত্র। দেশ বিভাগকালে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে তাদেরই পূর্বসুরী যেন রওশন। নাইন পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে। প্রচুর গল্প উপন্যাস পড়ে। নিজের ভিতরে একটি উদার ঋজু চেতনাকে লালন করে। পুরানো ঢাকার মহল্লার অভিজাত পরিবারের পুত্রবধু সে। তার চারিদিকে বিরাট দেয়াল তোলা আছে তার এই সামাজিক পরিচয়ের সুবাদেই। পোষাক পরিচ্ছদে, পঠন পাঠনে, আশে পাশের নিম্নবিত্ত গুটিকয় ছেলেমেয়েকে বাড়িতে এনে পড়ানো ও তাদেরই সম্পর্কিত বিবাহিত মেয়েদের জীবন জটিলতার সমাধান কল্পে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি দৃঢ় স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে রওশন। আতর বানুর স্বামী বিয়ের আট মাস পরে রেঙ্গুনে গিয়ে লাপাত্তা হয়ে গেলে ভাইয়ের সংসারে গঞ্জনার শেষ থাকে না আতর বানুর। আতর বানুর মায়াবী মুখ দেখে মমতা বোধ করে রওশন। আতর বানুর হয়ে তার স্বামীর কাছে চিঠি লিখে দেয় সে। খোঁজ খবর নিয়ে মহল্লায় এসে হাজির হয় আতর বানুর ধূর্ত স্বামী ইদ্রিস আলী। ইলিয়াসের কাছে দাবি করে অর্থ। হুমকি দেয় এই বলে যে, না হলে বলে দিবে এত বড় বাড়ীর বৌ তার কাছে বেনামীতে চিঠি লিখেছে। রওশনের শ্বশুর বাড়ীতে দেখা দেয় প্রবল পারিবারিক গোলযোগ। শ্বাশুড়ী এত বড় দুর্নামের পর এই বউকে বাড়ীতে রাখতে চান না। ইলিয়াস রওশনকে অনুরোধ করে মায়ের কাছে মাপ চাইতে। অস্বীকৃতি জানায় রওশন। চাচা শ্বশুর স্নেহের দাবিতে তার কিছু বলার আছে কিনা জানতে চাইলে নিশ্চুপ থাকে সে। যাও কিছু দ্বিধা ছিল, আতর বানুর আত্মহত্যার পর তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে আর কোন দ্বিধা থাকে নি। বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার আগের রাতে ইলিয়াস যখন বলে যে, ছেলে জর্জ মিয়াকে রওশন যদি

Dhaka University Institutional Repository

নিতে চায় তার ব্যবস্থা করে দেবে ইলিয়াস, সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে রওশন, শুধু বলেছে,

> বহুত মেহেরবানী আপনার। ও এখানেই থাকবে। মনকে যদি না মানাতে পারি লোক পাঠাব। দু এক হপ্তার জন্য যেতে দেবেন।[৬]

হতাশ বিপর্যস্ত ইলিয়াস যখন প্রশ্ন করেন,

> এতো শক্তি তুমি কোথা থেকে পাও রশনি?[৭]

তাঁর কণ্ঠের বেদনা আপ্লুত করে রওশনকে। তবু এ অশ্রু দেখাতে চায় না বলে বেড়িয়ে আসে বারান্দায়। রওশন বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় কিসলু দেখেছিল পলাতক ভঙ্গিতে চিলেকোঠার জানালায় দাঁড়িয়েছিলেন ইলিয়াস। পারিবারিক ব্যবসা ছেড়ে অনেকটা জেদের সাথেই মোক্তারিতে এসেছিলেন ইলিয়াস। কিন্তু পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও পরিবর্তিত জীবনচেতনার দ্বন্দ্বে পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়াতে ব্যর্থ হন ইলিয়াস।

মেকাইল সর্দারের পরীর মত সুন্দরী বোন পরীবানুর বিয়ে হয় এক সময় অভিজাত ও ধনী মীর্জা পরিবারের ছেলে দিলদারের সাথে। কিন্তু সেকালের পরিবর্তনের জোয়ারে বিষয় বুদ্ধির অভাবে নিঃস্ব হয়ে যায় দিলাদার। রাবেয়া খাতুন দিলদার-পরীবানুর জীবনের মধ্য দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীর মর্মন্তুদ বেদনার ছবি এঁকেছেন দক্ষতার সঙ্গে। পরীবানু এ বাড়ীর রান্না খেতে পারে না বলে ও বাড়ী থেকে তার জন্য খাবার আসে। কোথাও যেতে হলে ভাবীদের কাপড় ও অলংকার আনিয়ে পড়ে যায়। এ ধরনের অপমান একেবারে সংকুচিত করে ফেলে পরীবানুকে। অপমানের কান্না গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে থাকে।

বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে ছোট একটা চাকরি করে দিলদার আর গান বাঁধে। গান বাঁধাই এখন তার একমাত্র ঐশ্বর্য আর অহংকার। কিন্তু অর্থনৈতিক দীনতায় বসবাসের গ্লানিতে এক সময় উন্মাদ হয়ে যায় দিলদার। অন্যদিকে তারই আশ্রিত বোন লাডলি বিবি দু'বার বিয়ের পরেও স্বামীর সংসার করতে পারে নি। তার ছেলে লাট মিয়া গুন্ডা থেকে কালোবাজারী হয়েছে। লাডলি ভাসমান জীবন যাপন করলেও পুরনো অভিজাত্যে প্রথমে কালোবাজারী ছেলের সাথে থাকতে চায়নি। কিন্তু ভাই উন্মাদ হয়ে যাওয়ায়, পরীবানু বাপের বাড়ী চলে যাবার পর তাকে নেওয়ার জন্য ছেলে ঘোড়ার গাড়ী পাঠালে না যেয়ে তার আর উপায় থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

মেকাইল সর্দারের বাপ মা মরা ভাগ্নে কিসুল তারই বাড়ীতে থাকে। ঘটনাচক্রে খুব সাধারণ ঘরের মেহের নিগারের প্রেমে পড়ে যায় সে। টের পেয়ে মেকাইল সর্দার গোপনে দ্রুত মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। অসহায় কিসলু বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারে না। মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যায় কিসলু।

রাবেয়া খাতুন উপন্যাসে দেখিয়েছেন ধর্মের ভিত্তিতে অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে পাকিস্তানের জন্ম হল তার দুভাগের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভৌগলিক দূরত্বের দিকটি প্রথম স্বাধীনতার দিনেই উপলব্ধ হল, জাতির পিতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পূর্ব পাকিস্তান আসবেন কি আসবেন না তা নিয়ে দোদূল্যমানতা ও তার উর্দূ বক্তৃতা সাধারণ মানুষের বুঝতে না পারার মধ্য দিয়ে।

> দেহাতী মানুষেরা শব্দই শুনলো অর্থ বুঝলো না বোকা মুখে একে অন্যকে প্রশ্ন করতে লাগলো। আমাগো জাতির জনকে কি কইলো বাই আমাগো লাগি?[৮]

নতুন পাকিস্তানে হঠাৎ করেই বদলে গেল এত দিনের পরিচিত হিন্দু মুসলমানের অবস্থান,

> আজকের মিছিলের মেজাজ একেবারে অন্যরকম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খুবই কম। তাদের অস্তিত্ব গৌণ এবং মৌন। কিন্তু বিপরীত রেখায় তিনগুণ উৎসাহে লাফাচ্ছে এ শহরে সম্পূর্ণ নবাগত একটি দল, তাদের ভাষা উর্দূ।[৯]

এভাবেই দেশভাগের সময়ের বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা পরিবর্তনের স্রোতে এগিয়ে গেছে এ উপন্যাসের ঘটনাক্রম ও চরিত্রগুলির জীবন। সে সময়ের উত্তাল আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে বিরাট পটভূমিতে স্থাপন করে মানুষের জীবনের উত্থান-পতন, পরিবর্তনের বিষয়টিকে বিশাল ক্যানভাসে উপস্থাপন করেছেন রাবেয়া খাতুন। জীবনের নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত রওশনের পুরনো জীবনবৃত্তের মধ্যে ঘরকন্না করা হয়ে ওঠে না। আর নব্যশিক্ষিত চাকুরে ইলিয়াস অনেক কিছু বুঝেও ভাঙ্গনের মুখে বাঁধ দিতে পারে না। গান বাঁধা শায়রী দিলদার অর্থনৈতিক দৈন্যের আঘাতে উন্মাদ হয়ে যায়, নিম্নবিত্ত আতর বানুদের স্বামী রোজগারের খোঁজে পাড়ি জমায় ভিন্ন দেশে। মেকাইল সর্দাররা পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে নিজেদের অভিজাত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যান অবিরাম। লাট মিয়া ভগ্নস্তুপ থেকে উঠে কালোবাজারির চোরাবালি পথে নিজের উন্নতির দিকে মনোযোগী হয়ে উঠে। লাডলি বিবি, পরীবানুরা ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে স্রোতের টানে ভেসে যান। কিসলুরা মুসলমানদের জন্য পৃথক স্বাধীন আবাস ভূমির লড়াইএ নিজেকে যুক্ত করে। এরাই আগামী দিনের পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের উঠতি মধ্যবিত্ত দ্বিধান্বিত মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণী।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশ ভাগকালীন বাংলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক নানা পরিবর্তনের স্রোতে এগিয়ে গেছে রাবেয়া খাতুনের 'বায়ান্ন গলির এক গলি' উপন্যাসের ঘটনাক্রম। ব্যক্তি জীবনের পটভূমিতে সমাজ জীবনের রূপায়ণ উপন্যাসের পরিসরকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছে।

রিজিয়া রহমান

সূর্য সবুজ রক্ত

'সূর্য সবুজ রক্ত' (১৯৮১) উপন্যাসে রিজিয়া রহমান সিলেটের মংলাছড়ি চা বাগানের চা শ্রমিকদের জীবনের আনন্দ-বেদনা, হতাশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ঈর্ষা, দাম্পত্য প্রেম কলহ, শ্রান্তি-ক্লান্তির চিত্রই অঙ্কন করেছেন। একই সাথে চা শ্রমিকদের অতীত ইতিহাস, চা বাগান পত্তনের ইতিহাস, ইংরেজ গার্ডেনারদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে।

ইস্ট ইন্ডিয়া যুগের শেষ পর্যায়, ১৮২৬ সালে আসাম সীমান্তে বার্মার সাথে ব্রিটিশদের তুমুল যুদ্ধ হয়। চীনে একচেটিয়া চায়ের বাণিজ্য অধিকার ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর। ১৮৩৩ সালে চীন দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ বাতিল হয়ে যায়। এ সময়টাতেই নীলচাষীদের মধ্যে দেখা দেয় প্রচন্ড অসন্তোষ। এই অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে কিছু ভাল জাতের জংলী চা গাছ আবিষ্কৃত হলে ইংরেজরা চা আবাদের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠে। ততদিনে ইংরেজদের ইন্ডিয়ান জমিদারী কিনবার আইন পাস হয়েছে। উচ্চাভিলাসী ইংরেজরা ক্রমে এখানে জমিদারী কিনে চায়ের ব্যবসায় লেগে পড়ে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনীতির চেহারা বদলে গিয়ে শিল্পের কদর বৃদ্ধি পেলেও কৃষি ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ধারনা থেকে তখনও বৃটেনের সার্ফ ব্যবস্থার চিন্তা মুছে যায়নি। সার্ফ ব্যবস্থায় কৃষি মজুরেরা ছিল জমিদারের দাস। শুধু থাকা খাওয়ার বরাদ্দ ছিল তাদের, মজুরী বলে কিছু ছিল না। চা বাগানে মোটামুটি সে ব্যবস্থাই প্রচলন করা হয়। নীলচাষীদের নিয়ে ইংরেজদের খুব ঝামেলা হচ্ছিল। তাই এবার চা চাষে আর স্থানীয় মানুষকে মজুর হিসাবে বাগানে লাগাবার মত বোকামী করল না তারা। ইন্ডিয়ার অন্যান্য এলাকা থেকে মজুর আমদানী করল ইংরেজ প্ল্যান্টাররা। যেমন আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমেরিকায়।

Dhaka University Institutional Repository

আসাম, সিলেট, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এলাকায় ইংরেজরা চা বাগান ব্যবসায় জাঁকিয়ে বসল। কিন্তু এই চা বাগান বাণিজ্য প্রসারে কি নির্মম অত্যাচার করল চা শ্রমিকদের উপর ইংরেজ প্ল্যান্টাররা তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন রিজিয়া রহমান তাঁর উপন্যাসে।

> আমদানী হতে লাগল নতুন কুলি। সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল পরিষ্কার করে চায়ের আবাদ বসাতে গিয়ে শত শত কুলি সাপের কামড়ে মরল। বাঘের পেটে গেলো। হাতির পায়ে নিষ্পেষিত হলো। সে যুগের চালানের কুলিদের অবস্থা আমেরিকার নিগ্রো দাসদের মতই ছিল। পালিয়ে যাবার পথ ছিল না তাদের। বন্য জীব-জন্তু, রোগ-দুঃখ আর প্ল্যান্টারদের অমানুষিক অত্যাচার সয়ে তারা থেকে গেল। তাদের দুঃখের নিঃশ্বাসের বাতাসে চোখের পানিতে ভেজা চা বিক্রি করে ধনী হতে লাগল ইংরেজ বেনিয়ারা। সে সময় ইংল্যান্ডে অভিজাত সম্প্রদায় ইন্ডিয়ান টি পছন্দ করত। কিন্তু তারা জানত না ওই এক পেয়ালা চায়ের পিছনে রয়েছে কি অমানুষিক পরিশ্রম আর করুণ ইতিহাস! সেই সোনালী চা তারা যখন ঠোঁটে চুম্বন করত তারা জানতেও পারত না তারা আসলে মানুষেরই রক্ত পান করছে। জানত না কত কাল পিঠের চামড়া চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে। জানত না কত গর্ভবতী কুলি রমণীর গর্ভপাত হয়েছে গার্ডেনারদের নির্দয় লাথিতে।[১০]

তিনচার পুরুষ আগে যে কুলি মজুররা উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, সাঁওতাল পরগণা থেকে এদেশে এসেছিল, তারা টিপসই এর কন্ট্রাক্ট টাইম শেষ হওয়ার আগেই দেশে যাবার জন্য হাউমাউ করে কাঁদত। তিনচার পুরুষ না যেতেই চালানের কুলিরা এই সবুজ বাগানের মানুষ হয়ে গেল। এই কুলি কামীন চঞ্চলা, অর্জুন, লক্ষণ, লছমি, বিন্দিয়া, রাজিন্দর, রাজু, মুরলী, শ্রীমতি, হরিশছত্রি, বিনি, রুকমীনি, হরদেওর, চামেলী, হরিয়া, হরমতীদের জীবনযাত্রার সকল দিক মমতার সাথে রূপায়িত হয়েছে উপন্যাসে। অন্যদিকে চা বাগানের ম্যানেজার আশরাফ, তার স্ত্রী রিনা, এই চা বাগানের পূর্বের ম্যানেজার রবার্ট হলের চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে একটি ভিন্ন বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এই চা শ্রমিকদের জীবনে নিয়ে আসে দুর্ভোগ। অনাবৃষ্টিতে চাষাবাদ যেমন বন্ধ থাকে তেমনি চা গাছও হয়ে যায় পত্রশূন্য। তখন মাঝে মাঝে কোন কোন কুলি এই কাজ ছেড়ে দেয়ার কথা চিন্তা করে। কিন্তু তারা জানে এটা অসম্ভব। বিষ্ণুর উক্তিতে শোনা যায় তারই প্রতিধ্বনি-

Dhaka University Institutional Repository

> আরে আমরা হলাম কুলি। চা পাতার গন্ধ নিয়ে আমরা জন্মাই। চা পাতার গন্ধের মধ্যেই মরি। জঙ্গল ছাড়া যেমন পাখ-পাখালি জীব জানোয়ার থাকতে পারে না। তেমনি আমরা চা বাগান ছাড়া বাঁচি না। আমরা হলাম চা বাগানের জানোয়ার।[১১]

এই উচ্চারণে যতই ক্ষোভ দুঃখ আর অনুশোচনা থাকুক এটাই তাদের জীবনের বাস্তব সত্য। দু একজন কুলী কামীন বাগান ছেড়ে গিয়েছে কিন্তু চা বাগানের দুর্বোধ্য নেশায় আবার ফিরেও এসেছে।

তারা কাজ করে মোকামে, নার্সারীতে, সীড বাড়ীতে। সকাল আটটায় কারখানার সামনে থেকে কাজ বুঝে নিয়ে চলে যায় যার যার কাজে। তারপর অবিরাম চলে পাতা সংগ্রহের কাজ। পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে অনেক সময় কুলি মেয়েদের আঙ্গুলের ডগা হয়ে যায় অসাড়। ডগা ফেটে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে।

অনাবৃষ্টিতে চা বাগানে উৎপাদন যখন প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন জীবিকার্জনের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয় তারা। নিজেরা চাঁদা দিয়েই এই যজ্ঞানুষ্ঠান পালন করে। ব্রাহ্মণ পূজা পাঠ সম্পন্ন করার পর সকলেই প্রার্থনা করে। যজ্ঞে দেবতা খুশী হবে, বেকার কুলিরা কাজ পাবে, বাগানে অনেক পাতা উঠবে, সকলের রুজি বাড়বে। এই সম্মিলিত প্রার্থনার মধ্যে সকলেই আবার নিজ নিজ ব্যক্তিগত বেদনার আর্তিও ব্যক্ত করে দেবতার কাছে-

> বিন্দিয়া প্রার্থনা করল রাজিন্দর যেন সংসারী হয়, ওর ওপর থেকে কমলীর যাদু ছুটে যায়। লছমী কামনা করল তার বড় ঘরটার টালি দিয়ে জল পড়ে, ভগবানের কৃপায় এবার বর্ষার আগে ঘরটা সারাই করার পয়সা যেন তারা নিজেরাই জমিয়ে ফেলতে পারে। চঞ্চলা চাইল, ভগবান আমাদের কামাইটা বাড়তি হোক। ক্ষেতের ফলন ভাল হোক। মহাজনের ধার সব শোধ করে দিয়ে বালবাচ্চাগুলিকে পেট ভরে ভাত দিতে পারি যেন।[১২]

পূজার পরে শুরু হয় ভোজন পর্ব। এই দিন ওরা প্রাণ ভরে খায়। তারপর অনেক পুরুষ পাট্টায় গিয়ে মদ-চুয়ানিতে বুদ হয়ে ফিরে আসে ঘরে। সারারাত ধরে মন্ডপে চলে আনন্দ্যোৎসব। নৃত্য গীতে মুখরিত হয় সারা চা পল্লী।

চা উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়াটাই বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। সেই সাথে এই তথ্যও জানিয়েছেন ঔপন্যাসিক এই প্রক্রিয়াজাত চায়ের স্বাদ কেমন তা চা শ্রমিকরা জানে না। তাদের জীবন শুরু হয় এক মগ নিকৃষ্ট লবণ গোলা কড়ুয়া চা দিয়ে। অনাবৃষ্টিতে তারা যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

অতিবৃষ্টিও তাদের জীবনে আনে অশান্তি, কোন আমলে লম্বা এক ব্যারাক বানিয়ে দিয়েছে কোম্পানী। গরু ছাগলের মতো গুঁতোগুতি করে একটা ঘরে থাকে সবাই। বর্ষায় পানি পড়ে ঢল নেমে যায় ঘরে।

চা বাগানের এই কুলি শ্রমিকদের কুসংস্কারে বিশ্বাস প্রবল। ঝড়ুর বউ যখন উপর্যুপরি সন্তান প্রসব করে এক্লামসিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে তখনও তারা ভেবেছে গর্ভবতী অবস্থায় ঝড়ুর বউ যে সাহেবমারী টিলার জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কুড়িয়েছে তাই সাহেবমারীর টিলার ভূতে তাকে পেয়েছে। তাই তার এই মুমূর্ষ অবস্থা। ডাক্তার সিলেটের বড় হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে। ডাক্তার চলে গেলে বিলাপরত ঝড়ুর শ্বাশুড়ীকে চন্দনী বলে-

> রাম নাম কর মাসী। কি হবে হাসপাতালে নিয়ে। ওর ঘাড়ে এতদিন ছিল বড় ভূত। এবার এসেছে সাহেব ভূত। হাসপাতালে এর এলাজ নেই।[১৩]

এই সাহেবমারী টিলার নামকরণের পিছনে আছে এক নির্মম অত্যাচারের কাহিনী। এক অত্যাচারী সাহেব এ পথ দিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় এক বোঝা কাঠের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। বৃষ্টিতে রাস্তা কদর্মাক্ত থাকায় তার গায়েও কাদা মেখে যায়। ক্ষিপ্ত সাহেব যে মেয়েটি এই কাঠের বোঝা রাস্তায় রেখেছিল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল–

> লাথি আর চাবুকের ঝড়ে মেয়েটি গোঙাতে লাগল। নাক মুখ ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। পরনের কাপড় সাহেব টেনে খুলে ফেলেছিল। ভারি বুটের চাপে পিষ্ট হতে লাগল উলঙ্গ শরীরের মাংস। সভয়ে যারা দূরে সরে গিয়েছিল এই বিভৎস দৃশ্যে তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পরক্ষণেই বুঝি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটল। গোলমালের খবরে আরো কুলি ছুটে এলো তলব ঘর থেকে। ....চা গাছ ছাঁটাইয়ের দায়ের কোপে সাহেবের শরীর খন্ড বিখন্ড হয়ে গেল। অনেকগুলো মানুষের নীরবে মুখ বুজে সয়ে যাওয়া অত্যাচারের প্রতিশোধে ছোট সাহেবের দেহটা আর মানব দেহ বলে চিনবার অবস্থা নাই। বড় সাহেব কুলিদের এই মরিয়া অবস্থা বুঝে ব্যাপারটা বেশী গড়াতে দিলেন না। কাউকে শাস্তিও দিলেন না। ছোট সাহেবের বিখণ্ডিত দেহটা কফিনে ভরে বাগানের শেষ মাথায় টিলার উপর কবর দেওয়া হলো।[১৪]

সেই থেকে এই টিলার নাম সাহেবমারীর টিলা হলো। ব্রিটিশ প্ল্যান্টারদের অত্যাচারের স্মৃতি নিয়ে তা দাঁড়িয়ে রইল।

Dhaka University Institutional Repository

চা শ্রমিকরা সপ্তাহ শেষে মজুরী পায়। এই একটা দিনেই তারা অল্প বিস্তর আনন্দে থাকে। পাট্টায় গিয়ে চুয়ানীর নেশায় বুদ হয়ে থাকে একদিন।

> তারপর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই টাকাগুলো অবাধ্য মুনিয়া পাখির মত ঝাঁক বেধে উড়ে চলে যাবে মহাজন ফয়েজ আলীর কাছে। বাকি যা থাকবে তা খরচ হবে হাটে। একদিনের বাদশাহীর পর আবার ফকির।[১৫]

বাগানের প্রতি আকর্ষণ শুধু কুলি মজুরদের নয়। মাঝে মাঝে এমন প্ল্যান্টারও আসেন যারা এই আকর্ষণ অনুভব করেন নিজেদের মধ্যে। এমনি একজন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার আশরাফ আহমেদ। কোম্পানীর অন্য কর্মকর্তারা যখন স্ত্রী, ক্লাব, মদ, হাউজি নিয়ে ব্যস্ত আশরাফের ব্যস্ততা তখন চা বাগান সম্পর্কিত। চা বাগানের প্রতি আশরাফের দুর্বলতা অশেষ। কুলি মজুরদের মজুরী বাড়াতে, প্ল্যান্টিং এর উন্নতি করার জন্য ডিরেক্টরের সাথে অনেক বাদানুবাদ হয় তার। এই বাগানের অবসরে যাওয়া প্রবীণ প্ল্যান্টার রবার্ট হলের সাথে আশরাফ একটি আত্মিক টান অনুভব করেন। রবার্ট হল ৩৫ বছর আগে বার্মার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে এদেশে এসেছিলেন। এর পরে চা বাগানের প্ল্যান্টার হিসাবে রয়ে যান এই দেশে। একমাত্র মেয়ে ডোনাকে পাঁচ বছর বয়েসে পাঠিয়ে দিয়েছেন ইংল্যান্ডে। নিজে ফিরে যান নি, রয়ে গেছেন এখানে। অবসরের পর পেনশনের টাকা দিয়ে কুলি মজুরদের জন্য হাসপাতাল ও স্কুল করেছেন।

রবার্ট বিশ্বাস করেন কিছু মানুষ আছে চায়ের মানুষ। এই চা বাগানের নেশাই যাদের বাইরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। বাগান আর কুলিদের চিন্তা যারা করে। আশরাফ রবার্ট এর সাথে চা বাগানের উন্নতি করার বিষয়ে আলোচনা করে। নতুন প্লানটেশন দরকার, বেকার কুলিদের কাজ দেয়া দরকার। বোর্ড ডিরেক্টরকে সে এসব বোঝাতে পারে না। তার জুনিয়র ম্যানেজাররা তাকে সরানোর ষড়যন্ত্র করে। হতাশ আশরাফ চাকরী ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু স্ত্রী রিনার পেটে সন্তান আসার সুসংবাদে সিদ্ধান্ত পাল্টায় সে। নতুন উদ্যোগে কাজে নামে। নতুন প্লান্টেশনের জন্য লন্ডন অফিসে চিঠি লিখে। তার প্রস্তাব গৃহিত হলে অনেক বেকার কুলি কাজ পায়। কাজ পায় হরিয়া, ঘরও পায়। যুবক হরিয়া চামেলীকে বলে–

> আমি কোন দিন কর্জ নিয়ে খাব না দেখিস। পাট্টায় যাব না। অনেক টাকা জমাব। বাগান থেকে জমি পেলে গরু কিনব, লাঙল কিনব।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নে বিভোর হয় হরিয়া। কিন্তু চামেলী চা শ্রমিকদের জীবনের সত্যটা জানে তাই সে হাসতে হাসতে বলে–

> সবাই তাই বলে। তারপর আস্তে আস্তে বদলে যায়। পাট্টা আর মহাজনের দোকানে বাঁধা পড়ে।[১৭]

ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমান উপন্যাসের সমাপ্তিতে হরিয়ার জীবনচিত্রের মধ্য দিয়ে চা শ্রমিকদের এই জীবনসত্যকেই যেন এঁকেছেন-

> শিরদাড়া বাঁকা পৌঢ় হরিয়া মাথা নীচু করে ঘাড় গুঁজে পাতা তোলে। হরিয়া এখন সোজা হয়ে ওপরে তাকাতে ভুলে গেছে। হরিয়া দাঁড়িয়ে আছে সেই পুরনো মাটিতে। হরিয়ার পরনে ছেঁড়া ধুতির টুকরো। সারাদিনে পেটে পড়েছে এক পেয়ালা লবণ গোলা রং চা, আর এক মুঠো ছাতু। কাল হরিয়া তলব পাবে। তার সবটাই চলে যাবে মহাজনের কাছে আর পাট্টায়। হরিয়ার অনেক ধার। হরিয়ার ছেলেটা বাগানের গরুর পাল নিয়ে জঙ্গলে চরায়। চামেলী পাতা তোলে। আঙুল কেটে রক্ত ঝরলে চায়ের পাতা ছিঁড়ে ঘসে দেয় আঙ্গুলে। তবু ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে। জড়িয়ে যায় দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ শরীরে। চামেলীর হাতের রক্ত ঝরে বাংলাদেশে, ভারতে, শ্রীলংকায়। চায়ের পেয়ালায়।[১৮]

এভাবেই উপমহাদেশ জুড়ে চা শ্রমিকদের জীবনের নির্মম বাস্তবতা চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমান। তার 'সূর্য সবুজ রক্ত' উপন্যাস হয়ে উঠেছে চা শ্রমিকদের দুঃখ, বেদনা, হতাশা, আনন্দ, স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠা জীবনের আলেখ্য।

একাল চিরকাল

সমাজ বিবর্তন আর সভ্যতার অগ্রসরতার প্রেক্ষাপটে উত্তর বাংলার দিনাজপুর জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনের রূপান্তরের মহাকাব্যিক প্রকাশ রিজিয়া রহমানের উপন্যাস 'একাল চিরকাল'। এ উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস, তাদের অন্তর-বাহির, আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা অচরিতার্থতা, শোষণ-বঞ্চনা, ধর্ম, বিশ্বাস-কুসংস্কার এসব কিছুরই বেদনার্ত রূপায়ণ ঘটেছে। আরণ্যক সাঁওতালদের সংস্কার বিশ্বাসের আদিভৌতিক জগৎ, সভ্যতা তথা ধর্ম, অস্ত্র আর অর্থশক্তির আগ্রাসনে বিপর্যস্ত হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

> বিশাল আদিম আরণ্যক ভূখন্ড। এই আরণ্যক ভূখন্ডে বাস করে আরণ্যক মানুষ। ..প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের নীলাভ কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ, হড়। হড়রাই সেই নীলাভ অন্ধকারের পবিত্রতা দু'হাতের মুঠোয় ভরে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। আর অনেক দূর থেকে শংখিনী শাপের আঁকাবাঁকা দেহভঙ্গির কুটিলতা নিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে এগিয়ে আসে সভ্যতা।[১৯]

সভ্যতার যন্ত্রমানব যতই এই আরণ্যক সাঁওতালদের জীবনে এগিয়ে এসেছে ততই বিপর্যস্ত হয়েছে তাদের জীবন। ঐ বিপর্যস্ততারই এপিক বিন্যাস 'একাল চিরকাল'। উপন্যাসের শুরু হয়েছে হোপনা সোরেণ ও তালাময়ীর দাম্পত্য জীবনের অস্তিত্বের দ্বন্দ্বময় সংকট চিত্রণের মধ্য দিয়ে। হোপনা সোরেণ শিকার জীবন ছেড়ে কৃষাণ হতে চায়নি কখনও। তালাময়ী স্বপ্ন দেখে তার সন্তান বড় কৃষাণ হবে। সময়ের এই পরির্তনকে এক সময় মেনে নেয় হোপনা সোরেণ, তালাময়ীকে বলে-

> নারে তালাময়ী। আমার চ্যাংড়া কলুই হবে না। কৃষাণ হবে। বড় কৃষাণ।[২০]

হোপনা সোরেণের ছেলে চুবকা সোরেণ চম্পাকে বিয়ে করে কৃষাণই হয়। কৃষাণ চুবকার উপলব্ধি–

> বাবা হোপনা সোরেণ কোন দিন জানতে পারল না মাটির বুকে ফসল ফলানোর কি আনন্দ। জানল না ধান বুনতে ধান কাটতে কত সুখ।[২১]

চুবকা, চম্পা, তাদের সন্তান সুরকা, মংলা, বাহা– তাদের নিস্তরঙ্গ শান্তিময় জীবনে অকস্মাৎ ঘটে দুর্ঘটনা। যেদিন বীর বাড়ি রেলস্টেশনে প্রথম বাঁশি বাজিয়ে রেল এসে থামল সেদিনই লাঙ্গলের ফলা বুকে বিঁধে মারা গেল তালাময়ী। লাঙ্গলের ফলা মার বুকে বিঁধেছে বলে চুবকা সোরেণের মনে হয় তার কৃষাণ হওয়াটা কি আসলে মার পছন্দ ছিল না? অন্যদিকে এই মৃত্যুর দিনেই প্রথম রেলগাড়ীর আগমন প্রতীকি তাৎপর্যে আভাসিত। আকালের সময় গ্রাম ছেড়ে যাওয়া গুনু ক্যালকাটার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ এবং পাদরীকে নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল পল্লীতে ধর্মীয় আগ্রাসনের সূচনা হয়। রাজা সাহেব, মহাজন দেওয়ানের অস্ত্র, অর্থ আর ষড়যন্ত্র সাঁওতাল পল্লীর নিস্তরঙ্গ জীবনকে একেবারে বিপর্যস্ত করে তুলে। এই নিঃস্ব বিপর্যস্ত অবস্থারই প্রকাশ ঘটেছে মারুন্ডী বুড়োরার বিলাপের মধ্য দিয়ে।

> দাবানলে বন পুড়ে যাচ্ছে। খরায় মাঠ জ্বলছে। বিদেশী রাজা, দেওয়ান, আড়তদার আর সাদা সাহেব সিনসাদুমের মত সাঁওতালদের সন্তান-সন্ততিকে গ্রাস করতে আসছে। তাদের এখন কোথায় লুকিয়ে রাখবে মারুন্ডী বুড়োরা?[২২]

Dhaka University Institutional Repository

রাজা সাহেব আর দেওয়ানের কথোপকথনে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন ঔপনিবেশিক শাসনের কুটিল রূপ এবং আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা-

> এখানকার সত্যাগ্রহ টেরোরিস্ট মুভমেন্টের চেহারা নিয়ে তিনি খুব একটা ভাবিত নন। ওরকম মুভমেন্টে তার শ্রেণী আসনটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। .....তার মানে এদের সব সময় অভাবের ভয় দিয়ে তাড়িয়ে বেড়াতে হবে। চমৎকার আপনার যুক্তিটা। এ অবস্থাটা অবশ্য অন্ন ও নিরন্নের পিক পয়েন্টের মাঝখানে একটা ব্যালেন্সিং পয়েন্ট। অর্থাৎ এরা ব্যালেন্সিং পয়েন্টকে অতিক্রম করে এক্সট্রিম কিছু করতে পারবে না।[২৩]

চুবকা সোরেণ, চম্পা, সুরকা, মংলা, বাগুরা, লাজা হাসদা, মানু, সম্পাহান, ফুলাও, পিউনি, তাংদাদের আদিম জীবনে সভ্যতার আগমন কেমন করে নিয়ে আসে বিপর্যস্ততা, অসহায়ত্ব, নৈরাশ্য, রূপান্তরিত হয়ে যায় তাদের জীবনযাপন তারই আলেখ্য ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেছেন, জীবন অবলোকনের ভিন্নতায়। আকালের সময় গরু কিনতে দেওয়ানের কাছ থেকে কর্জ নেয় চুবকা সোরেণ। পণ করে আগামী ফসল তোলেই প্রথমে ঋণ শোধ করবে। কিন্তু লাজা হাসদার মুখে উচ্চারিত হয় মহাজন, দেওয়ানদের ঋণের শৃংখলের কথা-

> ও রকম করেই তো সবাই কর্জ নিয়েছিল কাকা। সে কর্জ তো আর শোধ হলো না। আধিয়ারী কিষেণ হয়ে কেবল কর্জই নিচ্ছে সবাই। ফসল তুলে দিচ্ছি দেওয়ানের গোলায়। আমাদের ধান উঠে কোথায়? সবই তো কর্জ শোধে যায়।[২৪]

বাগুরা, বেসরা, তাংদা, জিনজিরা অভাবে দেওয়ানের ষড়যন্ত্রে খৃষ্টান হয়ে গেল। সারা পল্লীর সাঁওতালরা কর্জের জালে আটকে গেল। ফুলাও, পিউনিদের জীবন রাজা সাহেবের লালসার শিকার হয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। যে সুরকা সোরেণ রেলে চড়ে বাইরের পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে মনে করেছিল বীর বাড়ির স্টেশনটা তাকে নতুন পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে, সেখানেই সুরকা প্রতিদিন নতুন কথা জানতে পেরেছে। তা না হলে তো সে মহতের আদেশ, বোংগার কোপ আর সেরমার মেজাজের উপর নির্ভর করে অন্ধ হয়ে থাকত। বিকিয়ে যেত পাদরী সাহেব আর দেওয়ানের কাছে। তেভাগার আন্দোলনের ঢেউ সুরকা সোরেণের মাধ্যমে সাঁওতাল পল্লীর সকলকে আলোড়িত করে। নতুন জীবনবোধে তাদের মধ্য জন্ম নেয় দ্রোহ, সংগ্রামী চেতনা। সুরকা, মুংলার উচ্চারণে স্পষ্ট এই জাগরণ–

Dhaka University Institutional Repository

> হেই মোংলা চলে আয়। আমরা মা বাবাকে ছাড়িয়ে আনব। আমাদের ধান আমরা কেড়ে আনব।
>
> আমি সোরেণ হয়ে গেছি। আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি।[২৫]

কিন্তু রাজা সাহেব আর দেওয়ানের অস্ত্র শক্তি আর পেশীশক্তির কাছে গুঁড়িয়ে যায় সাঁওতালদের জাগরণ। পুড়ে যায় সমস্ত সাঁওতাল পল্লী। নিহত হয় চুবকা, চম্পা, সুরকা, তাওদা, তাহা, লাজা, ডোঙ্গা, মুনি। বেঁচে থাকল তারা যারা পাদরী আর রাজার আশ্রয়ে এসেছিল আগেই আত্মাকে বিকিয়ে।

আর বেঁচে থাকে মংলা সোরেণ মার্টিন লুথার সোরেণ হয়ে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন টিমের জরিপ কাজ শুরু হলে সেই শিলা প্রকল্পের নাইট গার্ড হয় মার্টিন লুথার সোরেণ। তার স্মৃতি বিধূরতার মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক সমাপ্তি টেনেছেন উপন্যাসের।

> মার্টিন লুথার সোরেণ হাঁটছে। শারজোম বিহারে মাটি কাটা শুরু হয়েছে। থমকে গেল মার্টিন লুথার সোরেণ। মাটি কাটতে কাটতে গান গাইছে ওরাওঁদের মেয়ে-
>
> সড়ক সড়ক তৈয়ার হৈল
>
> বাংলা তৈয়ার হৈল না।
>
> বাংলার মিস্ত্রী বড় চিমনী রে.....
>
> মুহূর্তে বিবর্ণ ধূসর শারজোম বিহার অস্পষ্ট হয়ে গেল। বিরাট এক সবুজ প্রান্তরের ছবি দুলে উঠল পলকের জন্য। বুকের ভিতর সুখ-দুঃখের অচিন ব্যথা নিয়ে স্বপ্নের পৃথিবীর মানুষ হয়ে গেল মার্টির লুথার সোরেণ। সেই যে অনেক দিন আগে, শালবনে চোখ রেখে একটি ছেলে সুখ দুঃখের বাতাসে ঝাপটা খেয়ে এ গান গাইত। সে আর তার বোন সেরমা দিসম তৈরী করতে চেয়েছিল। কে! কে এ গান গাইছে। সবুজ স্বপ্নের পৃথিবীটা অস্পষ্ট হয়ে গেল। মার্টিন লুথার সোরেণ দেখল শীতের ম্লান রোদে বিবর্ণ প্রাচীন শহরের শরীরে কোদাল বসাচ্ছে মজুরেরা।[২৬]

সভ্যতার ক্রমবিকাশে সাঁওতাল জনপদের বঞ্চিত মানুষেরা এভাবেই শিকারী থেকে কৃষক আর কৃষক থেকে খনি শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রিজিয়া রহমান সাঁওতালদের অস্তিত্বসংগ্রাম ও তার বিনাশের দর্পণে জাতিসত্তার সংগ্রাম ও তার পরিণতিকেই যেন প্রতীকী তাৎপর্য দান করেছেন। সাম্রাজ্যশক্তি, অস্ত্রশক্তি ও ধর্মশক্তির নির্মম আগ্রাসনে একটি জনগোষ্ঠির স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যলোপের ইতিবৃত্ত এই উপন্যাস। ইতিহাসের কঙ্কালের মধ্যে ঔপন্যাসিক সন্ধান করেছেন মানবাত্মার চিরায়ত সংগ্রামের প্রাণশক্তি।[২৭]

ভাষার ক্লাসিক সংহতি, গভীর অর্ন্তদৃষ্টি, ইতিহাসনিষ্ঠা, সমাজ সচেতনতা এবং শৈল্পিক সতর্কতা-সবকিছুর অন্তর্মিলনে রিজিয়া রহমানের এ উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ।[২৮]

সেলিনা হোসেন

যাপিত জীবন

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ থেকে শুরু করে ১৯৫২-র রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত সময়কালে সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন' উপন্যাসের ঘটনাক্রম বিন্যস্ত হয়েছে। সমাজসত্য ও ব্যক্তিচেতনা এই দ্বৈত স্রোতধারায় এগিয়ে গেছে এ উপন্যাসের কাহিনী। দেশ বিভাগের বেদনাদায়ক দিক, উন্মূলিত ব্যক্তি মানুষের আর্তনাদ, পারিবারিক নানা ঘটনার সাথে রাজনৈতিক ঘটনাস্রোতের প্রগাঢ় সম্পর্ক রচিত হয়েছে এ উপন্যাসে। এই উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে ভাষা আন্দোলনের প্রাক-পটভূমি ও বাঙালী জাতির আত্মজাগরণ অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।[২৯] জাতির সমাজ-রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং সেই সমস্যার আবর্তে ঘূর্ণিত ক্ষত-বিক্ষত ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের অন্তরঙ্গ বিন্যাসে এ উপন্যাস অনন্য। উপন্যাসের শুরুতে দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত সংকটের মর্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[৩০]

উপন্যাসে বিবৃত প্রধান চরিত্রগুলি অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। সোহরাব আলী, তার স্ত্রী আফসানা খাতুন নীরু, তিন ছেলে মারুফ, জাফর, দীপু বহরমপুরের বসতবাড়ীকে পিছনে ফেলে ঢাকায় চলে আসে। দেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী ঘটনাতাড়িত হয়ে নতুন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতেও তাদের জীবনের সংকটের অবসান ঘটেনি বরং সংকট আরো ঘনীভূত হয়। এই সংকটের আবর্তে বিভ্রান্ত দীপু তার বাবাকে প্রশ্ন করে-

> আমরা পালিয়ে এলাম কেন বাবা?[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের সূচনায় প্রশ্নের অভিঘাতে সেলিনা হোসেন প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখেছেন পাঠকের মনে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে।[৩২]

পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর থেকে ঢাকার বংশাল। কয়েকজন মানুষের এই পথ ও মানস পরিক্রমায় যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা অভিব্যক্ত হয়েছে চরিত্রগুলোর মানস গঠন অনুসারে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষক সোহরাব হোসেন নতুন দেশের অপরিচয়ের বেদনা ভুলার চেষ্টা করেছেন তার নিঃসঙ্গের সহচর উদ্ভিদের রাজ্যে। সোহরাব হোসেন ভেষজ ঔষধ প্রস্তুত করে সাধারণ মানুষের রোগ নিবারণ করেন তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরীর জন্য। তাঁর স্ত্রী আফসানা এই নিঃসঙ্গতাকে কাটানোর চেষ্টা করেন স্মৃতিচারণ করে। আকবর হোসেনের ছেলে জাফরের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে দেশ বিভাগ পরবর্তী ও ১৯৫২ পূর্ববর্তী তরুণদের সংগ্রামী চেতনা ও প্রেমানুভূতির সম্মিলিত প্রয়াস।

জাফরের জীবন তার সংগ্রাম এবং পরিণতির মধ্যে 'যাপিত জীবন' উপন্যাসের মৌল বক্তব্য নিহিত।[৩৩] আঞ্জুমের সাথে তার পরিচয়ে মিষ্টি অনুভব রোমান্টিক ভাল লাগার সমন্বয়ে তার মানসিক পরিপূর্ণতা ও তীব্র চেতনার উন্মেষ ঘটে। একদিকে প্রেমানুভূতি অন্যদিকে আবেগঘন সংগ্রামমুখীনতাই তরুণ জীবনে সৃষ্টিশীলতার উন্মোচন ঘটায়। জাফর ও আঞ্জুমের ভালবাসার মধ্য দিয়ে সে আত্মশক্তি ও সৃষ্টি ক্ষমতাকে উপলব্ধি করে অন্যদিকে তার মধ্যে বিকাশ লাভ করে তার বিপ্লবী চেতনা, তীব্রভাবে অনুভব করে জীবনের উদ্দাম মুহূর্তের আকর্ষণ।

১৯৪৭ এর ডিসেম্বরের বারো তারিখের ঘটনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে মিছিল ঢাকার রাজপথে দেখা গিয়েছিল ভাষার প্রশ্নে তা ছিল প্রথম মিছিল। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী তা চরমে পৌঁছায়। সাড়ে চার বছরের দ্রুতগতি ঘটনাস্রোতে মানুষ কেবল ভেসে যায়নি। তরঙ্গশীর্ষে উঠে প্রতিরোধে দৃঢ় সংকল্প হয়েছে। সেই ধৃতব্রত সংকল্প কঠিন তরুণদেরই একজন জাফর।[৩৪]

জাফরের এই আকস্মিক সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অসংগতিপূর্ণ আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সচেতন তরুণদের মনোজগতে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। দ্বিজাতিভিত্তিক তৎকালীন পাকিস্তানে অধিকারের পথরোধক কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রে বাঙালী একটি নিজস্ব ভুবনের আকাঙ্ক্ষায় সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। মা আফসানা খাতুন, বড় ভাই মারুফ, ছোট ভাই দীপু সহ জাফর নিজে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। নায়ক জাফরসহ পরিবারের সব সদস্যই প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। জাফরের পরিবারটি যেন প্রতীকী অর্থে পুরো

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ হয়ে উঠে। ভাষার প্রশ্নই হঠাৎ সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিল তখন, এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার রাজনৈতিক প্রশ্নটি সকল তরুণ হৃদয়েই প্রবল বেগে আছড়ে পড়েছিল।

> জাফর অনুভব করেছিল রাজনীতি নামে একটা জিনিষ আছে। সেটা যদি মহৎ কোন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ না হয় তাহলে তা বিষাক্ত সাপের চাইতেও ভয়ঙ্কর।[৩৫]

এভাবেই অধিকার আদায়ের এই রাজনৈতিক প্রশ্নে সকলেই আন্দোলনে নেমেছিল মিছিল করেছিল কারণ মিছিল মানেই স্বাদেশিকতার বহ্নি উৎসব। যে উৎসবে সভ্যতা কৃষ্টি সংস্কৃতি নিরন্তর পুড়ে পুড়ে পরিশুদ্ধ হয়।

এভাবেই উপন্যাসে তমুদ্দুন মজলিশ, আবুল কাশেমের প্রবন্ধ, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বিষয়ক ডঃ শহীদুল্লাহর আলোচনা, মুনির চৌধুরীর বক্তৃতা, ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে ১৯৪৯ সালের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনসহ শহরের অচলাবস্থা, আরমানিটোলা ময়দানের জনসমাবেশ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমকালীন গণঅসন্তোষ, ২১ ফেব্রুয়ারীর সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ঘটনা ইতিহাসনিষ্ঠভাবেই এসেছে। সময়ের দাবিতে জাফরের প্রণয়ী আঞ্জুমও যেন উপন্যাসে দেশের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়। প্রেম আর দ্রোহের চেতনায় এগিয়ে যায় জাফর। রাষ্ট্র ভাষা উর্দূ ঘোষণার সাথে সাথে এই উদ্দীপ্ত তরুণরা উত্তেজিত হয়ে উঠে-

> জানো না আমাদের বুকে আছে চকমকি পাথর। ঠুকলে আগুন ঠিকরে উঠে। যে আগুনে মাটি পুড়ে শক্ত হয়। আমরা যেমন গান গেয়ে ফসল তুলি তেমনি হাতুড়ি পেটাই।[৩৬]

এই চকমকি পাথর বুকে নিয়ে ভাষার লড়াইএ জীবন দেয় জাফর। এই শোকে মূহ্যমান পিতা সোহরাব আলী শেষ পর্যন্ত উদ্দীপ্ত হোন দৃঢ় সংকল্পে। উপন্যাসের শেষে তারই ইশারা-

> লক্ষ লোকের মিছিল।....কালো পতাকা ছাড়াও মিছিলের অগ্রভাগে শহীদের রক্তমাখা কাপড়ের পতাকা। শ্লোগানের শব্দে দ্রুত রাস্তায় নেমে আসেন সোহরাব আলী। গেটের উপর ভর দিয়ে দুহাতে বুক চেপে ধরেন। জাফরের রক্তমাখা জামাটা চিনতে তার ভুল হয় না। তিনি নির্নিমেষে সে জামার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কথা বলার শক্তি তার নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন তাদের সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন তা টের পাননি। বুকের উপর থেকে হাত নেমে আসে। সে হাত মুঠিবদ্ধ হয়ে উপরে উঠে। সোহরাব আলী অনুভব করেন তার বুকে কোন শোক নেই।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

আর–

> সে মিছিলের দিকে তাকিয়ে আঞ্জুম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে জাফর নেই।[৩৮]

উপন্যাসের শেষে এ দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে আত্মদানের প্রেরণায় ব্যক্তি ও সমষ্টি অস্তিত্বের যে রূপান্তর তারই শিল্পরূপায়ণ ঘটিয়েছেন সেলিনা হোসেন 'যাপিত জীবন' উপন্যাসে। যা কাহিনীকে সমকালীনতা থেকে চিরন্ততায় স্থাপিত করেছে।

চাঁদবেনে

ইতিহাস ও ঐতিহ্য কখনো কখনো প্রতিভার স্পর্শে নবতর জীবন- চেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠে। সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪) উপন্যাসে মনসা মঙ্গলের চাঁদ সওদাগরই যেন ভূমিহীন চাঁদের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মনসা দেবীকে অবজ্ঞা করে আপন শক্তিতে লড়াই চালিয়ে যাওয়া মধ্যযুগের মনসা মঙ্গলের নায়ক চাঁদ সওদাগরের ঐতিহ্যের কাছ থেকে একালের সামন্ত প্রভুর শোষণে পিষ্ঠ হতে হতে ভূমিহীন কৃষক চাঁদ শক্তি সঞ্চয় করে রুখে দেয় একালের মনসা আজু মৃধার প্রবল শক্তিকে। আকাঙ্ক্ষা করে একালের লখিন্দর জন্ম নেবে লোহার ঘরে নয়, মুক্ত পৃথিবীতে খোলা আকাশের নীচে। যে লখিন্দর রুখবে আজু মৃধাদের বেড়ে উঠাকে। এই কাহিনীই বিন্যস্ত হয়েছে সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে। মনসা মঙ্গলের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং সমকালের জীবন অভিজ্ঞতা এই দুয়ের পরস্পর অন্তরবয়নেই রচিত 'চাঁদবেনে' উপন্যাস। চাঁদ সওদাগরের মিথিক ঐতিহ্যকে সেলিনা হোসেন মানুষের অস্তিত্ব সংগ্রামের প্রেরণা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

উপন্যাসের শুরুতেই আমরা পাই চাঁদকে–

> কাজ করতে করতে হাতের উল্টো পিঠে কপালের ঘাম মুছে ও। মা আদর করে ডাকতো চাঁদ। বাপে আকিকা দিয়ে একটা নাম রেখেছিলো।..... বিয়ের কাবিন আর জমির দলিল ছাড়া কোথাও কাজে লেগেছিলো কি না ও জানে না, ...[৩৯]

মাঠে কাজ করতে করতে খরায় ফাটল ধরা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বিপন্ন বোধ করে চাঁদ। এই জমির মালিক চাঁদ নয়, আজু মৃধা।

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করে ফসল ফলানোর পরিবর্তে টাকা পাবে, শর্তটা এই। তবু মাটি ফাটা সহ্য করতে পারে নি। মনে হয়েছিল শরীরের রগে রগে কে যেন চাবুক মারল।[৪০]

এই মাটিতে ফসল ফলানোতেই ওর গভীর আনন্দ। তাই এই ফসল পুরোটা অজু মিয়ার গোলায় তুলে দিয়ে আসতে কষ্টে ওর বুক ব্যথা করে। কিন্তু এবার খরায় সব ফসল পুড়ে গেছে, মাঠ ফেটে চৌচির। এই খরায় চম্পাইগঞ্জের মানুষের মুখে ভাত নেই। এখানে দুবেলা শুধু আজু মৃধাই ভাত খেতে পারে।

ফারাক্কায় বাঁধ পড়েছে বলেই পদ্মা শুকিয়ে গেছে, জল নেমে গেছে মাটির অনেক নীচে। পদ্মার বুকে সামান্য পানি থাকলেও তা বালিতে বোঝাই, দুরন্ত যৌবনা পদ্মার দেখা পাওয়া এখন ভার। গ্রামের সাধারণ মানুষ না খেয়ে খেয়ে পদ্মার মতই শুকিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের স্ত্রী ছমিরণ একে একে অনেকগুলো মৃত সন্তান উপহার দিয়ে, আজ পাগলিনী। হাফিজ মিয়ার দশ জনের সংসার। ভাতের জন্য ভিক্ষা করতে সে যেতে চায় শহরে। চাঁদ বাধা দেয়। কথা দেয় খাদ্য সংগ্রহ করার। হাফেজ মিয়া শেষ থালা দুটো নিয়ে বিক্রির জন্য রওনা দিলে মেয়ে সখিনা বাধা দেয়। বাধা শুনে না হাফেজ মিয়া।

একা একা থাকলে মা-বাবার কথা মনে পড়ে চাঁদের। ছোট বেলায় যাত্রাপালায় দেখা চাঁদ সওদাগরের কথা মনে হয়। মনসার ক্রুর দৃষ্টি আজও সে ভুলতে পারে না। কিশোর বয়সে দেখা সেই কাহিনী তার সাম্প্রতিক জীবনসংকটের অভিজ্ঞতায় নতুন তাৎপর্য লাভ করে। আগে শুধু সাপটাই প্রধান হয়ে যেতো। এখন বোঝে বলেই চাঁদ সওদাগর প্রধান হয়ে উঠে।

খরার তাড়নায় মোসলেম মিয়া ভবিষ্যতে শ্রম দেয়ার শর্তে সের পাঁচেক চাল আনে–

হামাকের আর কি আছে শ্রম ছাড়া?

কি দরে ব্যাচলা?

আমন উঠলে তোফেলের জমিত কাম কর‍্যা ল্যাগবি তিন টাকা মজুরিত।[৪১]

এরকম পরিস্থিতিতেও খরার আতঙ্কে সর্বস্ব হারানোর বেদনায় মূহ্যমান হয়ে না পড়ে চাঁদ সওদাগরের মতই বিদ্রোহ করেছে চম্পাইগঞ্জের চাঁদ। লুট করেছে আজু মৃধার চালের গোলা। এই সংঘবদ্ধ আক্রমণে প্রমাণ হয় আজু মৃধারা প্রকৃতপক্ষে শক্তিহীন। মানুষের সংগ্রামী মনোবলের কাছে তাদের পরজীবী অস্তিত্ব খড়কুটোর মত। অনুর্বর ছমিরণের মৃত্যুর পর উর্বরতার সম্ভাব্য সতেজ ইঙ্গিত নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদের পাশে এসে দাঁড়ায় সকিনা। যার প্রেম ও সাহচর্যে চাঁদ অনুভব করে জীবনের নবতর তাৎপর্য ও সম্ভাবনা-

> সখিনার নরম মাটিতে ঘ্রাণ আছে। আছে সোঁদা গন্ধ। চাষা ক্ষেতের গন্ধ। নতুন চারার প্রাণময় সজীবতা আমাকে বদলে দিয়েছে। সখিনা আমাকে ফসলের স্পর্শ দিয়েছে। তাই আমার সাহস দ্বিগুণ হয়েছে।[৪২]

এই শক্তিতেই মঙ্গলকাব্যের দেবতা প্রত্যয়ী যুগে একজন বেপরোয়া চাঁদ অস্বীকার করেছিল তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্বকে, অগ্রাহ্য করেছিল অপদেবতার পূজাকে। তেমনি একালের নিঃস্ব চাঁদ আজু মৃধার দৌরাত্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে-

> আজু মৃধা আমার ভিটে দখল করে নিলে আমি লড়াই করবো, পরাজিত হলে বিন্দুমাত্র গ্লানি আমাকে আচ্ছন্ন করবে না। সেই শোক লালন করে আমি আবার প্রস্তুতি নেবো।[৪৩]

এই অনুভবেই চাঁদ যখন শুনে মহাজন আজু মৃধা তার বাড়ি দখলের জন্য ষড়যন্ত্র করছে, তখন চাঁদ বিলের শুকনো জঞ্জালে আগুন দেয়। সে আগুন বিলের মাটিতে জ্বলতে থাকে, মাটি পুড়ছে খবর পেয়ে মহাজন আজু মৃধা আসে এবং চাঁদকে শাসায়,

> তোর বেশী বাড় ব্যাড়ছে। বাড় হামি ছুট্যায়া ফ্যালামো। হামি জানি তুই ইচ্ছ্যা কর্যা হামার জমিত আগুন লাগাচো। .....হামি তোক পুলিশে দেমো। চম্পাইগঞ্জের ভাত তোর খাওয়া ল্যাগবি না হানে।
>
> চাঁদ রুখে দাঁড়ায়।
>
> কলেই হোল? চম্পাইগঞ্জ হামার। হামি ইকানেই থ্যাকমো। হামিও দেখ্যা নিমো চম্পাইগঞ্জ কার লাগ্যা ভাত র‍্যাখছে।[৪৪]

এরপর আজু মৃধার চড়ে ঝলসে উঠে চাঁদের হাতের ধারালো দা। একদিকে নির্মম শোষণ, অত্যাচার অন্যদিকে চাঁদের শেষ সম্বল বসতভূমি করতলগত করার চক্রান্ত চাঁদকে এই হত্যাকান্ডে প্রেরণা জোগায়। অত্যাচারিত ক্ষেতমজুর চাঁদ সাহস দেখিয়েছে। বিনাশ করেছে অত্যাচারীকে। তার চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে জীবনের নবতর সত্য।[৪৫] চাঁদের স্বগত চিন্তায় তারই প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসের আন্তিমে-

Dhaka University Institutional Repository

> আমি এই চম্পাইগঞ্জের স্বাধীন মানুষ। আমি এখন ধনপতি বণিক। আমার জাহাজ ভরা সাহস আর শক্তির পণ্য আছে।.....
>
> আমি নিঃশেষ হইনা। যে কোন মূল্যেই বিকিয়ে দেই না কেন আমার পণ্য অনিঃশেষিত। বাতাসে আমার বীজ ওড়ে। দেশের পলিমাটিতে সে বীজে চারা গজায়। দ্রুত বাড়ে সে মহীরুহ।..... চাঁদ সওদাগর মনসাকে দিয়েছিলো কড়ে আঙ্গুল দিয়ে পূজো। কড়েতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি চাই মুন্ডু। বিচ্ছিন্ন ধর থেকে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তে কীর্তিনাশায় পলি ফেলে যে উর্বরা ভূমি তৈরী করবে আমি সেখানে ফসল ফলাবো। নিষ্ফলা মাটিতে ফসলের রগরগে বৈভব।[৪৬]

এভাবেই ফসলের সমারোহের মধ্যে জন্ম নিবে তার আর সকিনার সন্তান নব লখিন্দর। সখিনাকে জড়িয়ে ধরে সে সেই আশ্বাসই উচ্চারণ করে।

> সখিনা তুমি আর আমি তেমন লখিন্দারের জন্ম দেব যারা আজু মৃধাদের বেড়ে উঠাকে রুখবে। চম্পাইগঞ্জের মাটিতে আর কোনো আজু মৃধা থাকবে না।[৪৭]

নিপীড়িতের অভ্যুদয়ের আহবানে আশ্বাসে শেষ হয়েছে কাহিনী।

এভাবেই আজু মৃধার অত্যাচারপীড়িত যন্ত্রণাময় অনাহারী জীবন, নিঃসন্তান স্ত্রী ছমিরনকে নিয়ে বেদনা, হাফিজ মিয়া সহ সকলকে নিয়ে খরা পাড়ি দেয়ার সম্মিলিত প্রয়াস চিত্রণে 'চাঁদবেনে' হয়ে উঠেছে নিঃস্ব ক্ষেতমজুরদের জীবনচিত্র। তবে এ উপন্যাসে ব্যক্তি উদ্যোগ ও সক্রিয়তাই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে সমবেত উদ্যোগের ইঙ্গিত সত্ত্বেও এ উপন্যাস ব্যক্তিকথায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতিতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি প্রতীকের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। চাঁদের চেতনা ও সক্রিয়তার ক্রমবিকাশে সমাজসত্তা ও ব্যক্তিমানসের অন্তঃসম্পর্ক ও অন্তর্বয়নের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।[৪৮]

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) উপন্যাসে সেলিনা হোসেন নাফ নদীর তীরবর্তী শাহপরি দ্বীপ ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ধীবর জীবনের স্বপ্ন, সংগ্রাম, বাস্তবতা চিত্রময় বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন। জীবন

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন ও রূপায়নের ক্ষেত্রে 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' উপন্যাসে সেলিনা হোসেন যে সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পটভূমিতে তা অভিনব ও স্বতন্ত্র শিল্পমাত্রায় গৌরবোজ্জ্বল। শাহপরি দ্বীপ, বদর মোকাম, আর সেন্ট মার্টিন দ্বীপের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে জলবেষ্টিত মানুষের অস্তিত্ব সংগ্রাম, বেঁচে উঠার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে।

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মালেকের স্বপ্ন সম্মিলিতভাবে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা বা বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, জেলে পাড়ার সবাইকে নিয়ে সমিতি করার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তার প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে। মালেকের সৌন্দর্যদৃষ্টি ও প্রীতি উপন্যাসের শুরুতেই বদর মোকাম থেকে শাহপরি দ্বীপের সৌন্দর্য অবলোকনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে–

> দূরে শাহপরি দ্বীপের নারিকেল গাছ ঘন সবুজ, যেন দ্বীপটাকে মমতায় বেষ্টন করে রেখেছে। টেকনাফের মাটি পাথুরে বলে সবুজ কম, কিন্তু শাহপরি দ্বীপে সবুজের চকমকি। ..... পায়ের কাছে ঢেউ এসে ভিজিয়ে দেয়, বাতাসের ধাক্কায় ডিঙি দোলে। মালেক অনেক দূরে বার্মার মংডু শহরের পাহাড়ের নীলাভ মাথা দেখে, সেই সঙ্গে সবুজ গাছ-গাছালি।... ছোট বেলায় একবার সারাদিন ডিঙি বেয়ে চলে গিয়েছিল মংডুতে।[৪৯]

সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে এ অঞ্চলের মানুষেরা বলে জিনজিরা। জিনজিরা তাদের কাছে মাছ আর শুঁটকির ব্যবসাকেন্দ্র। সবাই এখানে আসে কোন না কোন কাজে। শুধু মালেকই আসে এমনি ঘুরতে। সৌন্দর্যে ভাল লাগে তার, চোখ জুড়ায়। ওর কাছে এ দ্বীপের জন্ম, বেড়ে উঠা, টিকে থাকা ইত্যাদি বিশাল ভাবনা। এই মালেকের ঝিনুক সংগ্রহের যে কষ্টকর বর্ণনা ঔপন্যাসিক দিয়েছেন তার মধ্য দিয়েই কাজটি যে কি পরিশ্রমের তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-

> দুহাতের মুঠোয় একগাদা ঝিনুক নিয়ে, ভুস করে মাথা উঠায় মালেক, মাথা ভার। বেশীক্ষণ ডোবালে এমন হয়, চোখের রক্ত ধূসর হয়ে যায়। এখন আর ভাল লাগছে না, ডিঙ্গি প্রায় অর্ধেক ভরেছে।..... শরীর আজ বড়ো তাড়াতাড়ি বিগড়ে গেল। অথচ ও তো জানে, পুরো ভাদ্রই ঝিনুক তোলার মৌসুম, এরপর আর সময় থাকবে না। ঝিনুক তুলতে যত কষ্ট সেই পরিমাণ আয় নেই, বেশীর ভাগই খালি যায়। ...তবু সময় নষ্ট না করে ও ঝিনুক খোঁজে।[৫০]

সংগৃহীত এই মুক্তো মালেক নিয়ে যায় সাফিয়ার কাছে। জেলে পাড়ায় মালেক সবচেয়ে বেশী ঝিনুক উঠাতে পারে সবার আগে। মালেক এই সাফিয়াকে ভালবাসে। কিন্তু জানে সাফিয়া তাকে পছন্দ করে

Dhaka University Institutional Repository

না। সাফিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক ব্যবসার। সাফিয়া নিপুন হাতে ঝিনুক খোলে ভিজায়। নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেখান থেকে বের করে আনে মুক্তা। সব ঝিনুকে মুক্তা থাকে না, ফাঁকা ঝিনুকের সংখ্যাই বেশী। এই মুক্তা থেকে মালেক সবটার ভাগ পায় না। সাফিয়া দুএকটা মুক্তা সরিয়ে ফেলে, ভাবে–

> বেশ কিছু জমলে একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রি করে অনেক টাকার মালিক হয়ে যাবে। ভালো করে ঘর বানাবে, সোনার নাক ফুল গড়বে, মংডু শহর ঘুরে আসবে।[৫১]

সাফিয়ার এই চুরি নিয়ে মালেকের কোন দুশ্চিন্তা নেই। সাফিয়ার স্বার্থঘনিষ্ট আচরণ উপলব্ধি করেও সে থাকে নির্বিকার। সংকীর্ণ স্বার্থ বুদ্ধি থেকে সে মুক্ত। আশৈশব সমুদ্রের বিশালত্ব, উদারতার প্রতি যে আত্মিক টান অনুভব করেছে মালেক তা-ই তাকে মুক্ত করেছে এসব ক্ষুদ্রতা থেকে। সে কারণেই স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন সাফিয়ার ভালো লাগে না মালেককে।

> জেলে পাড়ায় মালেক দাপুটে পুরুষ, হাঙর ধরে, মাছ মারে, ঝিনুক তোলে, ঘরে ছাউনি দেয়। এত কাজ আর কেউ পারে না। তবু সাফিয়ার কাছে ওর ঠাঁই নাই। কেননা ওর একটি দোষ, সে নিজের স্বার্থ বুঝে না। বড় বেশী সরল আর বোকা। সাফিয়া ভালবাসে মাতাল শুক্কুরকে। শুক্কুরটা আসলেই পুরুষ মানুষ, রোয়াব দেখাতে পারে, দাপট আছে।[৫২]

অথচ স্বার্থের কারণে এই সাফিয়া মাঝে মাঝে মালেকের সাথেও ঘনিষ্ঠ আচরণ করে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে শুক্কুরকে। কিন্তু শুক্কুরের সাথে তার দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। শুক্কুরকে যখন জুয়া খেলার সঙ্গী ছুরি মেরে মেরে ফেলে সে সময় সাফিয়া বেদনার পরিবর্তে মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছে।

মালেকের বাবার ছিল সমুদ্রের প্রতি প্রবল টান। সমুদ্র তাকে যেন সম্মোহিত করে রাখত। ডাঙ্গার চেয়ে জলে থাকতেই তিনি পছন্দ করতেন বেশী। তার মৃত্যু হয়েছিল ঝড় কবলিত হয়ে সমুদ্রে। বাবার মত মালেকেরও রয়েছে সমুদ্র প্রেম। মালেক নিজের বুকের ভিতর অনুভব করে সাগরের গর্জন। তবে শুধু সমুদ্র প্রেম নয়, জেলে পাড়ার মানুষের দুঃখ, দৈন্য, লাঞ্ছনা, অসহায়ত্ব তাকে পীড়িত করে। সে সকলের জীবনের সকল ব্যথা, বেদনা, লাঞ্ছনার অবসান চায়। অনুসন্ধান করে মুক্তির পথ। জীবন বাজি রেখে এই জেলেরা মাছ, হাঙর শিকার করে, সমুদ্রের গভীর থেকে অনেক কষ্ট করে ঝিনুক তুলে আনে কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন পরিবর্তন আসে না। তোরাব আলী, গনি মিয়া অর্থ ও পেশী শক্তির জোরে কেড়ে নেয় তাদের শ্রম ঘামের অর্জনকে। মালেক এই হতদরিদ্র মানুষদের জীবনে আনতে চায় স্বাচ্ছন্দ্য ও বেঁচে থাকার আনন্দ। তার এই স্বপ্ন ও স্বপ্নের জন্য সংগ্রাম তাকে পরিণত করে এক বিশাল মানুষে।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্যকাল থেকে মালেক এই জেলে পাড়ার দুর্দশা দেখেছে, দেখেছে কি করে এই গরীব জেলেদের শোষণ করে বিত্তবান ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠে তোরাব আলী, গনি মিয়ারা। বাদল, তাহের, রজবের অসহায়ত্ব, সুজার পরিবারের দুর্দশা, বশির আলীর দারিদ্র্য, জুলেখার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ফলে মর্মান্তিক মৃত্যু মালেককে তীব্রভাবে ব্যথিত করে। সবাইকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে এই অবস্থার পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে মালেক। কিন্তু সে দেখেছে সবাই একা একা বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। পুরো জেলে পাড়ার জন্য কেউ ভাবে না। সে জানে দশজনের কলজে মাড়িয়ে যে গনি মিয়াদের উদ্ভব, তার এই অগ্রযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তারাই, তাই বলে কাজ বন্ধ করলে চলবে না।

> গনি মিয়ারা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সংখ্যায় কম কিন্তু ওদের বিশাল বপু দৈত্যের মত হিংস্র। আসলে জেলে পাড়ার লোকগুলো এক হলে গনি মিয়ার মত দশ জনকে হটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কেউ এক হতে চায় না, সবাই চায় নিজে বড় হতে। জেলে পাড়ার উন্নতি কেউ ভাবেও না, বুঝেও না।[৫৩]

তার চেতনায় নানা প্রশ্ন উত্থিত হয়–

> আঁরার বাগুনের জাল না হয় ক্যান, হক্কলে পত্যদিন ভাত না পায় ক্যা?[৫৪]

প্রবল অধিকার চেতনা মালেককে আলোড়িত করে। অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সাফিয়ার নির্দয় উদাসীনতা, বিচিত্র ফাঁক ও ফাঁকির মধ্যেও জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসায় এগিয়ে যায় মালেক। সবাইকে নিয়ে সমিতি গড়ে তোলার চিন্তা করে সে। সবার সাথে আলাপ করে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করে। অনুভব করে কেউ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে না এলে কিছুতেই এই কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না। জেলে পাড়ার দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে নীরবে কাজ শুরু করে মালেক। হাঙর ধরার সময় এলে তোরাব আলীর ট্রলার নিয়ে হাঙর শিকার করতে যায় মালেক। এর মধ্যে সে জানতে পারে আকিলার বাপের কলেরায় মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা। তারই ছোট ভাই সালেক বশির আলীর মেয়ে জুলেখার সঙ্গে প্রেম সম্পর্ক অস্বীকার করে বিয়ে করে অর্থ ও ক্ষমতাবান গনি মিয়ার মেয়ে রহিমুনকে। অর্থের লোভে সালেক এ কাজ করেছে মালেক বুঝতে পারে। অন্যদিকে অন্তঃসত্ত্বা জুলেখা উপায়হীনভাবে আত্মহত্যা করে। এসব মৃত্যু মালেককে উদ্ভ্রান্ত করে তোলে। সে তীব্রভাবে অনুভব করে সম্মিলিত সংঘ শক্তির প্রয়োজন। অর্থবানদের সাঁড়াশি চাপে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হতে চলা নিম্নবিত্তের মানুষদের জাগিয়ে তোলার জন্য সমবায় সমিতি গড়ে উঠে মালেকের নেতৃত্বে। তোরাব আলীর বাড়ীতে ডাকাতির মিথ্যা অভিযোগে যেদিন সুজা, তাহের, রজবকে পুলিশ গ্রেফতার করে

Dhaka University Institutional Repository

সেদিনই প্রথম প্রকাশ্যে মালেকের সমিতির সদস্যরা মিছিল বের করে। এভাবেই মালেকের স্বপ্নময়তা সজ্ঞচেতনা স্বাতন্ত্র্য ধীবর পল্লীর প্রথাবদ্ধ, নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রাণের সঞ্চার করে।[৫৫]

> বিকেলে মালেকের নেতৃত্বে মিছিল বের হয় জেলে পাড়ায়। সমিতির প্রথম পদক্ষেপ। বানানো ডাকাতি কেস বাতিল করো, তোরাব আলীর দমননীতি চলবে না, সর্বত্র উত্তেজনা। সফল মিছিল হয় ওদের। এত লোক সাড়া দেবে ভাবতেই পারে নি মালেক। আনন্দে চোখে জল আসে। প্রয়োজনে মানুষ একত্র হয়। দরকার এই শক্তিকে কাজে লাগানো। তোরাব আলীর বাড়ীর সামনে উত্তাল হয়ে উঠে জনতা। তচনচ করে ফেলে কাচারি ঘর। ওদের তিন জনকে ফিরিয়ে আনার জন্য দাবি জানায়। চাপে পড়ে রাজী হয় তোরাব আলী।.....বক্তৃতা করে মালেক, আবেগে উত্তেজনায় কণ্ঠ গমগম করে। মানুষ অধীর আগ্রহে শুনে মুহূর্মুহু করতালিতে অভিনন্দন জানায়।[৫৬]

465302

মিছিল শেষে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে তারা মিটিং করে অনেক রাত পর্যন্ত। গভীর রাতে একাকী বাড়ী ফেরার পথে তোরাব আলীর লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় মালেক। সকালে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে জেলে পাড়ার মানুষেরা নিয়ে যায় হাসপাতালে। বিকেলে সমিতির লোকেরা মিছিল বের করে। আবার আক্রান্ত হয় তোরাব আলীর বাড়ী। আবার সব থেমে যায়। ঝিমিয়ে পড়ে জেগে উঠা মানুষগুলো। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে একরকম পরাজিতের চেতনা অনুভূত হয় মালেকের মধ্যে। দু'মাস পরে সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে আবারো স্বপ্নের পথেই নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করে মালেক। তোরাব আলীর মধ্যে বিজয়ীর দাপট। এরই মধ্যে মালেক কঠোর পরিশ্রম করে হতাশ না হয়ে আবার তিলে তিলে গড়ে তোলে সমিতি। সুজার দশ সন্তানের পরিবারের দায়িত্বও নেয় মালেক। উদয়াস্ত খেটে এদের ভাতের ব্যবস্থা করে সে। এর মধ্যেই হাঙর শিকারের সময় এগিয়ে আসে। এবার সমিতির উদ্যোগে নৌকা কিনে হাঙর শিকারের পরিকল্পনা করে মালেক। সফল হয় তার স্বপ্ন। শিকারের সরঞ্জামাদি সম্মিলিতভাবে সংগ্রহ করে দলবল সহ হাঙর শিকারে সমুদ্রে যাত্রা করে মালেক। এই যাত্রায় শাহপরি দ্বীপের মানুষের যে আনন্দ উল্লাস তার প্রকাশ উপন্যাসে ঘটেছে এভাবে-

> সমবায়ের নৌকা বলে ঘাটে লোক থৈ থৈ। ওর প্রথম পদক্ষেপ সফল হয়েছে, সেই আনন্দে সেই গর্বে ও উত্তেজিত। সমবায়ের একটা নৌকা হয়েছে বড়শী হয়েছে, আস্তে আস্তে নৌকা, বড়শি, জাল বাড়বে। সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে, দেইখা এ্যান ডর অগ্যা হাঙর ধইরগাম যা শাহপরি দ্বীপের কেউ কোনদিন ন ধরিত পারে।

ঠিকই কইয়ন মালেক ভাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ জেলেরা উৎসাহে হাততালি দেয়।

এইবার তুঁই মারো, তারপর আঁরা মারইগ্যম। তোরাব আলীর নাকের সামনে ঝুলাই রাইখ্যম।

হো হো হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে ওরা। হাসি আনন্দে নৌকা ভাসে ওদের।[৫৭]

এরপর ওরা গভীর সমুদ্রে চলে যায়। বড়শি নামিয়ে দেয় সমুদ্রে। একদিন একদিন করে চার দিন চলে যায় বড়শিতে কোন টান পড়ে না। বাদল, করম একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। মালেকেরও গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না। পাঁচদিনের দিন হঠাৎ বড়শিতে টান। টান বেশ প্রবল- মালেক গভীর মনোযোগে নিরীখ করে। কুলকিনারহীন অথৈ সমুদ্রে যেন ওর বুকের ভিতর গর্জে উঠে।

...উত্তেজনায় ওর বুক এখন ধুপ্‌পুর, ধুপ্‌পুর।[৫৮]

মালেক অনুভব করে বিরাট হাঙর, একটা নয় একজোড়া। চারপাশের নৌকা ট্রলারেও খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। সমিতির নৌকা বলে সবার আগ্রহও বেশী। মুখে মুখে খবর পৌঁছে যায় শাহপরি দ্বীপে। এরপর শুরু হয় হাঙরের সাথে শক্তির পরীক্ষা। হাঙর নির্জীব না হওয়া পর্যন্ত তোলা যাবে না। এখন এ যেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জেলে সান্তিয়াগোর সেই অবিরাম যুদ্ধ। অবশেষে আরও পাঁচ দিন পরে শক্তির পরীক্ষায় দুর্বল হয়ে পড়ে হাঙর। এবারে হাঙরকে তোলার চেষ্টা শুরু হয়-

মালেক তৈরী হয়, প্রথম হাঙরটা ও একাই টেনে তুলবে। .....প্রায় দেড়মণ ওজনের হাঙরটা টেনে তুলতে ভীষণ কষ্ট হয় ওর। নৌকার উপর ধপাস্ করে ফেলতেই লেজে বাড়ি মেরে নড়ে উঠে হাঙরটা। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মরণ কামড় দেয়। সতর্ক হবার সময় ছিলো না মালেকের। ডান হাত চলে যায় হাঙরের মুখে। বাদল আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে।

.....চুপ হারামজাদা। পানিরডা টানি উডা।

ওর ধমকে থতমত খেয়ে বাদল বিমূঢ় হয়ে দ্বিতীয় হাঙরটি টেনে তোলার চেষ্টা করে। মালেক বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কাঁধের কাছের ক্ষত চেপে ধরে। শরীর থেকে হাত একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। চামড়ার সাথে ঝুলছে, যেন একটু টান পড়লেই আলগা হয়ে যাবে।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিকূল সময়ও সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শাহপরি দ্বীপের ধীবর পল্লীতে বর্ধিত হয়েছে যে মালেক তীরহারা সমুদ্রের অথৈ পাথারে দুরন্ত হাঙরের সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে উপনীত হয়েছে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে- সে পরাভব মানবে কেন। মানব কল্যাণের মন্ত্রপ্রতিজ্ঞা যার ধমনীতে, সে তো প্রতিটি দুঃসময়ে জেগে উঠবে নতুন করে। তাইতো উপন্যাসের শেষে মালেকের অচেতন চৈতন্যের মানস কথোপকথন-

> রক্তের রেখা গড়ায় পাটাতনে। অচেতন হবার মুহূর্তেও দেখতে পায় বাদল তখনো দ্বিতীয়টি টেনে তুলতে পারে নি, ধস্তাধস্তি করছে। ও শুনতে পায় এগিয়ে আসা ট্রলারের শব্দ, ওর মাথায় স্বপ্নের বুযবুড়ি, মনে হয় ও একটা বিশাল পরিবারের প্রধান পুরুষ। হাজারো দায়িত্বে নিয়োজিত, অথচ কিছুই গুছিয়ে করা হয় নি। মগজে শেষবারের মতো বুযবুড়ি হয়ে ভেসে উঠে শাহপরি দ্বীপ। ঐ দ্বীপের কেউ যেটা পারে নি ও তা পেরেছে। ও সবচেয়ে বড় দুটি হাঙর জোড়ে ধরেছে। ওর শক্তি ফুরোয় নি। ও ওর হাজার মানুষ সম্বলিত পরিবারের কাজগুলো শেষ করতে পারবে। মিলিয়ে যায় শক্তি, ফুরিয়ে যায় চেতনা। বুঁজে যায় চোখ। মগজের আলোকিত রেখার মাথায় বিন্দুর মতো এগিয়ে আসে একজন পরাজিত মানুষের ছায়া। ও প্রাণপনে সেই ছায়া তাড়াতে চায়। আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের বুকে হাজার হাজার বুযবুড়ি ওঠে আর মিলিয়ে যায়, ওর আর কিছু মনে থাকে না।[৬০]

সেলিনা হোসেন মালেকের এই চেতন-অচেতনের দোলাচলে "বেগুনের জন্যে প্রেম"– সবার জন্য প্রেম– ভিত্তিক মানবিক সমাজ গঠনের প্রত্যয় ও সেই প্রত্যয় ধারণকারী মানুষদের অবয়বই রূপায়িত করতে চেয়েছেন এই ধীবর পল্লীর মানুষদের মধ্যে। এভাবেই তিনি মালেক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ধীবর পল্লীর হতদরিদ্র জেলেদের স্বপ্ন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক সার্বজনীন জীবনসত্য রূপায়নের চেষ্টা করেছেন।

নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ পূর্ববর্তী প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন ব্যাপক গণমানুষের চেতনায় জাগরণের ঢেউ তুলেছিল। সেই ঐতিহাসিক সময়কে এবং দেশ বিভাগ পরবর্তী রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষকে সেলিনা হোসেন তার 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ এই এক দশকে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের সাফল্য ঐতিহাসিক চরিত্র বিকাশের মধ্য দিয়ে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন সেলিনা হোসেন। একইসাথে উপন্যাসে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রস্তুতি ও দ্বিধাদ্বন্দ্বও রূপায়িত হয়েছে জীবনবোধের বস্তুনিষ্ঠতায়।

উপন্যাসের শুরু হয়েছে সোমেন চন্দের রেল শ্রমিকদের মাঝে গিয়ে ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য কার্যক্রম পরিচালনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে। আর শেষ হয়েছে ১৯৫৩ সালে জেলখানায় বসে মুনির চৌধুরী 'কবর' নাটক লিখছেন এই বর্ণনায়।

'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাসের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি সোমেন চন্দ মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে রেল কোম্পানীর এক খুপরি ঘরে এসে উঠে রেল শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। তার বাল্যবন্ধু ভূষণ এখন রেলের ড্রাইভার। সেই ভুষণের বাড়ীতেই তার খাবার ব্যবস্থা হয়। ভূষণ নিয়ে আসে বা ও গিয়ে খেয়ে আসে। মেট্রিকের পরে ভূষণের আর পড়াশুনা হয়নি। বাবাহীন নয় ভাই-বোন আর মাকে নিয়ে ভূষণের সংসারে সে-ই একমাত্র উপার্জনকারী। ভূষণের জন্য কষ্ট হয় সোমেনের। মনে মনে ভূষণের কাছে প্রতিজ্ঞা করে,

> তোর দায়িত্ব আমিও ভাগ করে নেব।[৬১]

বেঁটে খাটো মানানসই চেহারা, মায়াময় নীলচে চোখ দুটো স্বপ্নালু। ধীর-স্থির তারুণ্যের দ্যুতিতে ঝলমল সোমেন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর পরিবর্তনপ্রয়াসী ঐতিহাসিক চরিত্র।

সোমেনের আগে এই রেল শ্রমিকদের মধ্যেই একসময় কাজ করেছেন জ্যোতির্ময়দা। ১৯৩২ সালে ঢাকায় ট্রেন ডাকাতির রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেল খেটে এসেছেন। জ্যোতির্ময়দা অল্প বয়েসে বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত হোন দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। যক্ষ্মারোগ নিয়ে জেল থেকে বের হোন তিনি। বীণাদি ভালবাসেন এই জ্যোতির্ময়দাকে। বীণাদি তাঁর স্কুল চাকুরীর বেতন জমিয়েছেন কলকাতায় গিয়ে জ্যোতির্ময়দা'র চিকিৎসা করানোর জন্যে। কিন্তু কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না জ্যোতির্ময়দা'কে। সোমেনও বীণাদির হয়ে চেষ্টা করেছে রাজি করাতে, পারে নি। বরং এই মুমূর্ষ অবস্থায় বীণাদির জীবন থেকেও সরে যেতে চান তিনি। বীণাদি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই মৃত্যু প্রবলভাবে ব্যথিত করে ভূষণ, সোমেনদের। এর মধ্যেই সোমেন গল্প লেখে। 'বনস্পতি' নামে গল্প শেষ করেছে। 'ইঁদুর' লিখছে। উপন্যাস 'বন্যা' লিখে প্রকাশের জন্য 'সবুজ বাংলার কথা' পত্রিকার সম্পাদক নির্মল ঘোষকে চিঠি লিখে।

শ্রমিকদের মাঝে থেকে এই জীবন সম্পর্কে তার উপলব্ধি অনেক গভীর হয়। শ্রমিকদের জীবনের অভাব বেদনাও অনুভব করতে পারে। তাই শামসুর বউ অসুস্থ দেখে বাবার পাঠানো বিশ টাকা তুলে দেয় শামসুর হাতে। ইউনুসকে বউ পেটানো থেকে নিবৃত করতে চেষ্টা করে। ভূষণের সাথে মীরার বিয়ের উদ্যোগ নেয়। ভূষণের বোন উমার বিয়ে ঠিক করে রঞ্জনের সাথে। কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতি লেখক সংঘ, প্রগতি পাঠাগারের কাজের সূত্রে সোমেনের বন্ধুত্ব সরলানন্দ, অমৃত, কিরণ, রণেশ দাসগুপ্ত প্রমুখের সাথে। তাদের সাথে সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয়। ভবিষ্যতের কর্ম পরিকল্পনা করে, সাহিত্যের আড্ডার আয়োজন করে তারা। যেখানে সোমেন তার লিখা 'দাঙ্গা' গল্পটি পাঠ করে। প্রগতি লেখক সংঘ, রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য বাড়ানোর জন্য নিরলস কাজ করে যায় সোমেন।

এর মধ্যে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধকে উপমহাদেশের প্রতিবাদী শক্তিসমূহ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে। এতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করায় মার্কসবাদীরা কেউ কেউ গ্রেফতার হন। কেউ স্বগৃহে অন্তরীণ হন। কেউ আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হোন।

এ সময় সোমেনের কাজের ব্যস্ততা বেড়ে যায় অনেক। ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ইউনিয়নের সম্পাদক নিযুক্ত হন তিনি। প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্ত। কিন্তু রণেশ দাশগুপ্ত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেয়ায় এখানে সোমেনের অনেক কাজ করতে হয়। রণেশ দাশগুপ্ত বয়েসে তার চেয়ে সামান্য বড় হলেও সোমেনের তাঁর সাথে গভীর বন্ধুত্ব। রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধের গভীরতা তাকে উদ্বুদ্ধ করে। যুদ্ধের ভয়াবহতা বাড়ছে, বেকারত্ব বাড়ছে, দারিদ্র্য এবং অনাহার চরমে উঠেছে। মানুষ নিজের ভিতরে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

> ইউনিয়নে কাজ করা যে কি মুস্কিল, সবাই শুধুই ভয় পায়। চাকরি যাওয়ার ভয়ে অস্থির, এসব চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠে সংগঠনের সবাই।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

অথচ সোমেন এর মধ্যে দ্বিগুণ তেজে কাজ করে যায়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রগতি লেখক সংঘের সক্রিয় কর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় ছাত্র। আধুনিক কবিতা লেখে। এই হতাশার মধ্যে সে সোমেনকে প্রশ্ন করে,

> তোর মধ্যে হতাশা নেই কেন রে সোমেন?
>
> হতাশ হলে নিজেকে পরাজিত মনে হয়। যতক্ষণ শক্তি আছে সংগ্রাম করবো কিন্তু পরাজিত হতে চাই না।[৬৩]

এর মধ্যেই সোমেনের পড়াও এগিয়ে চলে। মার্কস-লেনিন, সমাজ সভ্যতা ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন সবকিছুই টানে ওকে। ইংরেজীটা খুব ভাল বুঝে না বলে বেদনা অনুভব করে। এসব ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্তের সাহায্য নেয়।

একসময়কার সন্ন্যাসী সরলানন্দ মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। মাও সেতুং এর জীবনী লিখেছে, চীনের গণবিপ্লবের আখ্যান লিখতে শুরু করেছে। রণেশ দাশগুপ্ত, প্রগতিশীল প্রাবন্ধিক কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামীর সংস্পর্শে সোমেন মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। প্রগতি লেখক সংঘের সভা একেক দিন একেক জায়গায় হয়। কখনো নারিন্দায়, কখনো দক্ষিণ মৈশুণ্ডি, কোর্ট হাউস স্ট্রিট, পাটুয়াটুলি, সূত্রাপুর কিংবা গেন্ডারিয়ায়। নতুন নতুন ছেলেরা আসে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী নয় এমন কিছু লেখকও আলোচনায় নিয়মিত আসেন সংঘের মানবিক বিপ্লবী ও কল্যাণকর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। অন্যদিকে শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের মধ্য দিয়ে সোমেন শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিতে বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীর উৎখাত চায়। এর মধ্যে একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রগতি লেখক সংঘের উদ্বোধন হয় কাজী আব্দুল ওদুদের সভাপতিত্বে। কাজী আব্দুল ওদুদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয় সোমেন। আন্দামান ফেরত 'টেররিস্ট' বিপ্লবী কর্মী সতীশ পাকড়াশির সান্নিধ্য পায় সে, তাঁর মুখে শোনে বিপ্লবের রাজ্যে সাহিত্যের সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা। স্পেনের সাহিত্যিকদের শোষণ দমন ও ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদানের গল্পে অনুপ্রাণিত হয় সোমেন। পাকড়াশির সাথে সেও বিশ্বাস করে,

> সাহিত্য সাধনায় লাঞ্ছিত গণমানুষের মর্মকথা ফুটিয়ে তুলার যে প্রেরণা সে প্রেরণাই লেখককে গণমানুষের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

হিটলারের ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বাহিনী সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ দখল করে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে অগ্রসর হয়। হিটলারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জাপান ইন্দোচীন ও বার্মাকে দখল করে সমগ্র এশিয়াকে মুঠোয় নিতে উদ্যত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি লেখক সংঘের লেখকরা ঢাকায় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠন করে। এখানেও দায়িত্ব পালন করে সে,

> এই সমিতির উদ্যোগে সোমেন দায়িত্ব গ্রহণ করে সোভিয়েত চিত্র প্রদর্শনীর, সোভিয়েত মেলার। 'ক্রান্তি' নামের একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ সফল হয়।[৬৫]

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে সূত্রাপুর সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করা হয় ৮ ই মার্চ ১৯৪২-এ। সভা শুরুর আগেই ঢিল ছোড়াছুড়ি, গেটের মুখে মারপিট আরম্ভ হয়, উদ্দেশ্য সভা পন্ড করা। পুলিশের গুলিতে বিরোধী পক্ষের এক কর্মী সুখেন নিহত হয়। কিন্তু সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের সময় মতো প্রতিরোধে সভা একটু দেরি করে হলেও শুরু হয়। সোমেন শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল করে সভাস্থলের দিকে আসার পথে লক্ষ্মীবাজার, হৃষিকেশ দাস রোডের মোড়ে প্রতিহিংসায় ক্রুদ্ধ উন্মত্ত এ দেশীয় ফ্যাসিস্টরা কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে তাকে। মানুষের মুক্তির আর জীবনকে সুন্দর করার স্বপ্ন দেখা সোমেন মাত্র বাইশ বছর বয়সে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

> সোমেনের মৃতদেহ নিয়ে বন্ধুরা শ্মশানে যাচ্ছে। অনেকের সাথে সঙ্গী হয়েছেন বঙ্কিম মুখার্জী আর জ্যোতিবসু। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, নিস্তব্ধ সবাই। টপ টপ করে পানি ঝরছে, মুখে শব্দ নেই। সকলের বুক জুড়ে প্রজ্বলিত চিতার আগুন।[৬৬]

সোমেনের আত্মত্যাগের মহিমায় সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তরাধিকারের ভিত নির্মিত হয়। গঠিত হয় ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ। রণেশ দাশগুপ্তের মনে হয়–

> ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ ও জাপানের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তুতি হলো পরোক্ষ প্রেরণা। আর প্রত্যক্ষ প্রেরণা হলো সোমেনের আত্মদান।[৬৭]

সোমেনের মৃত্যুর পর প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও তীব্র হয়। কিরণ, অমৃত, অচ্যুত গোস্বামী, রণেশরা প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য 'প্রতিরোধ' নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রগতি লেখক সংঘের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। নতুন নতুন সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

যুক্ত হয়। উল্লেখযোগ্য নতুনরা হলেন মুনির চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সানাউল হক, সৈয়দ নুরুদ্দিন, অধ্যাপক অজিত গুহ, আবদুল মতিন, গাজীউল হক প্রমুখ। মুনির চৌধুরী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইএসসি পাশ করে ফিরে এসেছে। পাথরের বোতাম লাগানো শেরওয়ানিতে তাকে অন্য রকম লাগে। পান, সিগারেট খায় প্রচুর। পড়াশুনার গভীরতাও সেই রকম। বাবা সরকারের বড় চাকুরে। তাতে কি, সে মার্কসীয় ভাবাদর্শে দারুনভাবে অনুপ্রাণিত। কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার হওয়ায় পার্টি অফিস সারাক্ষণ সরগরম থাকে। 'প্রতিরোধ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে লেখকদের আড্ডা হয়। গণবিপ্লবের ধারায় শিল্পসম্মত গল্প লেখক হিসাবে সোমেনের নাম ওদের মুখে মুখে। সিদ্ধান্ত হয় সোমেনের স্মরণ উৎসব পালনের। সরদার ফজলুল করিমের প্রস্তাবে 'প্রতিরোধ- সোমেন চন্দ স্মৃতি সংখ্যা' বের করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সোমেন স্মৃতি উৎসবে সোমেনকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। সবার মুখে মুখে ওর নাম উচ্চারিত হয়–

> একটি রক্তাক্ত মৃত্যুকে সামনে নিয়ে বাংলা সাহিত্য ও রাজনীতির শুভ উদ্বোধন ঘটে।[৬৮]

বিশ্বযুদ্ধ ও মন্দার অনিবার্য ফল হিসাবে এ অঞ্চলে নেমে আসে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া–

> নিরন্ন মানুষের হাহাকার গ্রাম থেকে ছুটে আসে শহরের দিকে। ...তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের কবলে গ্রাম বাংলার মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ল। ...কে কাকে বাঁচাবে? যারা বাঁচাতে চায় তাদের ক্ষমতা সীমিত। যারা বাঁচাতে পারবে তারা নিজ নিজ ভাগ বাটোয়ারায় ব্যস্ত। বিপন্ন মানবতার জন্য ওদের কোন মাথা ব্যথা নেই। রাস্তার ধারে পড়ে থাকে মানুষ। কাক-শিয়ালে খুবলে খায় তাদের শরীর।.....রণেশ সত্যেন সেনরা একটা কমিটি করেছে। চাঁদা তুলে রিলিফ দিচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। তবু শেষ রক্ষা হয় না। মৃতের সংখ্যা বাড়তেই থাকে।[৬৯]

এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে জয়নুল আবেদীনের ছবি মানুষকে প্রভাবিত করে প্রবলভাবে। এই ছবি দেখে মুগ্ধ হোন মুনির চৌধুরী। দুর্ভিক্ষের ছায়া শেষ হতে না হতেই আবার শুরু হয় দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিষিয়ে উঠে ঢাকার বাতাস। প্রগতি লেখক সংঘের সদস্যরা পাড়ায় পাড়ায় শান্তি কমিটি গঠন করে পাহারার ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে তারা স্বপ্ন দেখেন-

> যুদ্ধ মহামারী দুর্ভিক্ষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বিভেদকে অতিক্রম করে লাল নিশানের ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। যেখানে মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে না, যেখানে মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

> ছোট বড় ভেদে সত্যিকারের মানুষের মর্যাদা পায়। মন্বন্তরের বাংলাদেশে একদিন সুদিন আসবেই।[৭০]

মুনির চৌধুরী মার্কসীয় আদর্শের অনুসারী হওয়ায় তার বাবা হালিম চৌধুরী তার লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করে দেন। হলের প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্ররা ওকে হল থেকে বের করে দিতে চায়। রেলিং গলিয়ে ওর তোষক বালিশ ফেলে দেয়। বলে,

> তুমি তো কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টরা মুসলমান নয়, সুতরাং এই হলে তুমি থাকতে পারবে না। তোমার থাকার অধিকার নেই।[৭১]

এরপর পার্টি অফিসে গেলে কৃষক নেতা ও লেখক সত্যেন সেন তাকে বুঝান ভয় পাবার কিছু নেই–

> রংপুরের তেভাগা আন্দোলন কেমন দানা বেঁধে উঠেছে। .....কৃষকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ..... নীলফামারীর ডিমলা, ডোমার আর জলঢাকা থানার অবস্থাতো সাংঘাতিক। ওখানকার জোতদাররা চাষীদের ঐক্যে তটস্থ। আর আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ওদের সঙ্গে হেরে যাবো? নিরক্ষর কৃষকরা যা পারে আমরা তা পারবো না মুনির?[৭২]

কিন্তু মুনির দ্বিধান্বিত-

> আমাদের একটাই ভয় সত্যেনদা, আমরা মধ্যবিত্তের সন্তান।[৭৩]

সত্যেন সেনের কাছে মুনির শুনে কৃষক নেতা কম্পরাম সিং এর রাজনৈতিক দৃঢ়তা আর অঙ্গীকারের কথা। সত্যেন সেন নিজেও ১৭/১৮ বছর ধরে কৃষকদের সাথে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। সাত বছর জেল খেটেছেন। গণসঙ্গীত রচনা করেছেন, উপন্যাস লিখেছেন। এই বিপ্লবী মানুষদের কথা শুনে তাদের সান্নিধ্যে এসে ক্রমশঃ উজ্জীবিত হয়ে উঠেন মুনির চৌধুরী।

একদিকে কংগ্রেস মুসলিম লীগের বিভেদের রাজনীতির বিষবাষ্পে ধর্মীয় উন্মাদনায় শুরু হয় ব্যাপক দাঙ্গা। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের পর থেকেই দেশ জুড়ে গণসংগ্রামের জোয়ার প্রবল হয়। নানা ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রমাণ করে মানুষ স্বাধীনতার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। যখন তেভাগা আন্দোলন, টংক প্রথা বিরোধী আন্দোলন, রেল শ্রমিক আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠে, তখন শহরে

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্তরা দাঙ্গায় মেতে উঠে। এই পরিস্থিতিতে রণেশ মুনিররা ২৪ জন বিপ্লবীর মুক্তি উপলক্ষ্যে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেন। এ উপলক্ষ্যেই মুনির চৌধুরী রচনা করেন নাটক 'মানুষ'।

এরকম পরিস্থিতিতে দাঙ্গার মধ্যেই দেশ ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিধা কাটে না প্রগতিশীল লেখক রাজনীতিবিদদের। রাষ্ট্র মানেই শুধু ধর্মীয় উন্মাদনা বা ধর্মীয় বন্ধন নয়। কিন্তু নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে তা-ই ঘটতে থাকে। এ সময় বাঙালী মধ্যবিত্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্তের অনেক টানাপড়েন থাকলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন দ্বিধামুক্ত। রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকলেও স্বদেশের মানুষের কল্যাণ চিন্তা, মমত্ববোধ ও বৃহত্তর স্বার্থের আদর্শই কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। সে কারণেই ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাজনীতির সাথে যুক্ত না থেকেও উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আজাদ পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছিলেন। সাতচল্লিশ উত্তর কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে আরবী কিংবা রোমান হরফে বাংলা লেখার তীব্র বিরোধিতা করে বলেন-

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান তা যেমন সত্য, তার চেয়েও সত্য আমরা বাঙালী। এটা কোন আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব সত্য।[৭৪]

১৯৪৭ পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অল্পসংখ্যকই সোমেন চন্দের মত বিপ্লবী দীক্ষা নিয়ে মধ্যবিত্তসুলভ রাজনৈতিক টানাপড়েন মুক্ত হতে পেরেছিল। কিন্তু এদের মাধ্যমেই রাজনীতি সচেতন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সূচনা ঘটে যারা পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এগিয়ে আসে। পাঠচক্র পরিচালনা, প্রগতি লেখক সংঘের সভ্য হওয়া, পত্রিকা প্রকাশ, দাঙ্গা প্রতিরোধ, চাঁদা তুলে লঙ্গরখানা চালানোর মধ্য দিয়ে এই শ্রেণীর বিকাশের সূচনা হয়। আর পঞ্চাশের দশকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যদিও তাদের রাজনৈতিক টানাপড়েন ঐতিহাসিক সত্য, যে সত্য মুনির চৌধুরীর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে–

> সোমেন মধ্যবিত্তের বেড়ী অতিক্রম করে সর্বহারা হতে পেরেছিল। আমি জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয়েছি।[৭৫]

মুনির চৌধুরী রাজনীতি থেকে সরে গেলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

> প্রত্যক্ষ রাজনীতি আর নয়, বরং এদেশের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার দায়িত্ব আমার। সে কারণেই সভা সমিতিতে বক্তৃতা করাকে আমি সামাজিক দায়িত্ব মনে করি।[৭৬]

এভাবেই সেদিন ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শহীদুল্লাহ কায়সার, তাজউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুল হক, জয়নুল আবেদীন, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরদার ফজলুল করিম, মনসুর উদ্দীন, রণেশ দাশগুপ্ত, আবুল হাসনাৎ, আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আসে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সাফল্য।

পাকিস্তানে জাতিগত শোষণ, ধর্মীয় শোষণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাঙালীর প্রথম সফল আন্দোলন ভাষা সংগ্রামে অংশগ্রহণের অপরাধে কারারুদ্ধ হন মুনির চৌধুরী। কারারুদ্ধ অবস্থায় ৫৩-এর ভাষাদিবস পালন উপলক্ষ্যে রচনা করেন তার ঐতিহাসিক নাটক 'কবর'।

এভাবেই সোমেন চন্দ, মুনির চৌধুরীর রাজনৈতিক ও শৈল্পিক ক্রিয়াশীলতার মধ্যে জাতিসত্তার পরবর্তী সংগ্রাম ও সাফল্যের প্রেরণাশক্তি সন্ধান করেছেন সেলিনা হোসেন। ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার দ্বৈত পদবিক্ষেপে জাতীয় অস্তিত্বের যে রূপ রূপান্তর ঘটেছে তার অনিমেষ সত্তার স্বীকৃতি 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাসের বিষয়ভাবনাকে করেছে সমকালস্পর্শী ও সংগ্রাম দীপ্ত। শুধু তাই নয় সোমেন চন্দ, মুনির চৌধুরীর মত ব্যক্তিত্বের জাতীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরে উপন্যাসটিকে সেলিনা হোসেন বাঙালী জাতিসত্তার আত্মপরিচয় উদঘাটনে একটি ঐতিহাসিক দলিল রূপে নির্মাণ করেছেন।[৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। রাবেয়া খাতুন, *বায়ান্ন গলির এক গলি* (নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা; ১৯৮৮), পৃ. ১৮

২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

৭। ঐ

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

৯। ঐ

১০। রিজিয়া রহমান, *সূর্য সবুজ রক্ত* (সাহিত্য বিলাস, ঢাকা; ২০০৪), পৃ. ৭১

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

১৭। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

১৯। রিজিয়া রহমান, *একাল চিরকাল* (সাহিত্য বিলাস, ঢাকা; ২০০৪), পৃ. ৭

২০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

২৭। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস- বিষয় ও শিল্পরূপ* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৭), পৃ. ২৯৩

২৮। বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*(বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯১), পৃ. ৪৮

২৯। বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯১), পৃ. ৪৯

৩০। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৭), পৃ. ৩০৪

৩১। সেলিনা হোসেন, *যাপিত জীবন* (মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮১), পৃ. ১৩

৩২। ফরিদা সুলতানা, *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৯), পৃ. ১৮৪

৩৩। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৭), পৃ. ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

৩৪। অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা; ১৯৮৭), পৃ. ১১৮

৩৫। সেলিনা হোসেন, *যাপিত জীবন* (মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮১), পৃ. ৫০

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৩৯। সেলিনা হোসেন, *চাঁদবেনে* (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; ২০০৫), পৃ. ৯

৪০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৪১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৪২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯-১২০

৪৫। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা; ১৯৮৭), পৃ. ১১০

৪৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

৪৭। ঐ

৪৮। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৭), পৃ. ২৯৯

৪৯। সেলিনা হোসেন, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ২০০৭), পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৫০। ঐ

৫১। সেলিনা হোসেন, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ২০০৭), পৃ. ৩

৫২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২-৩

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৫৪। ঐ

৫৫। রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ও শিল্পরূপ* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৭), পৃ. ২৫৪

৫৬। সেলিনা হোসেন, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ২০০৭), পৃ. ১০১

৫৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

৫৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৫৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৬০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

৬১। সেলিনা হোসেন, *নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি* (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; ২০০৭), পৃ. ৩২

৬২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৬৩। ঐ

৬৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৬৫। আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ২০০৩), পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

৬৬। সেলিনা হোসেন, *নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি* (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; ২০০৭), পৃ. ৫৬

৬৭। ঐ

৬৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

৬৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৭০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৭১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

৭২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

৭৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৭৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

৭৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৭৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

৭৭। ফরিদা সুলতানা, *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৯), পৃ. ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনোপলব্ধি ও সমাজচেতনা (১৯৯১-১৯৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রের পতন ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিয়ে শুরু ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮, গবেষণার এই সময়কাল। শোষণ পীড়ন সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে সজ্ঞচেতনা, প্রতিবাদী মানসিকতার প্রকাশও ঘটেছে এ দশকে। গ্রামীণ ও শহুরে নাগরিক জীবনের বিচিত্রমুখী জটিলতার রূপায়ণ ঘটেছে একালে রচিত কিছু কিছু উপন্যাসে।

এ সময়ে মহিলা ঔপন্যাসিকদের দ্বারা রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো– দিলারা হাশেমের শঙ্খকরাত (১৯৯৫), অনুক্ত পদাবলী (১৯৯৮); রাবেয়া খাতুনের এই বিরহকাল (১৯৯৫), বাগানের নাম মালনীছড়া (১৯৯৫), প্রিয় গুলশানা (১৯৯৭); রিজিয়া রহমানের হারুন ফেরেনি (১৯৯৪); সেলিনা হোসেনের কালকেতু ও ফুল্লরা (১৯৯২), ভালবাসা প্রীতিলতা (১৯৯২), গায়ত্রীসন্ধ্যা (১৯৯৪), দীপান্বিতা (১৯৯৭), যুদ্ধ (১৯৯৮); নাসরিন জাহানের উড়ুক্কু (১৯৯৩), ক্রুশকাঠে কন্যা (১৯৯৮), চন্দ্রের প্রথম কলা (১৯৯৪), সোনালী মুখোশ (১৯৯৬), বৈদেহী (১৯৯৭); রাজিয়া খানের দ্রৌপদী (১৯৯৩)।

রাবেয়া খাতুন

এই বিরহকাল

১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরকেন্দ্রিক যে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ ঘটে তাতে বিপুল সংখ্যক নারী শিল্প-শ্রমিক পরিচয় লাভ করে। সমাজে 'গার্মেন্টসের মেয়ে' নামে পরিচিত এই মেয়েদের জীবনের একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে রাবেয়া খাতুনের 'এই বিরহকাল' উপন্যাসে। অন্য উপন্যাসের মত এখানেও নারীর নিজস্ব পৃথক সংগ্রাম, মাতৃত্বের টানাপড়েন, স্বতন্ত্র চেতনার প্রকাশ ঘটেছে চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে।

'এই বিরহকাল' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আগুন। বিয়ের আগে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ায় বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে প্রেমিক সেলিমের সাথেই বিয়ে হয় আগুনের। সেলিমের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে সে। যমজ সন্তানের মৃত্যু ও সেলিমের পালিয়ে যাওয়া জীবনের এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করে আগুনকে। রাবেয়া খাতুন আগুনের মধ্য দিয়ে চলতি সমাজের স্রোতকেই যেন ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের রূঢ় কঠিন বাস্তবতা 'এই বিরহকাল' উপন্যাসে হাসপাতালের আয়া জিদ্দিবু, সিনেমার একস্ট্রা হেলালী, জোছনা, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐশ্বর্যের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন তিনি।

বিধবা মায়ের মেয়ে আগুন ক্লাশ নাইনে পড়ার সময়ই ব্যবসার কাজে তার গ্রামে আসা দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই সেলিমের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। মা টের পেয়ে ভয়ানক রেগে যান। প্রতিবেশীদের রূঢ় আচরণে আগুন যখন দিশেহারা তখন সেলিম এসে বিয়ে করে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ঢাকায়। কুমারী মেয়ের মাতৃত্ব যে কী ভয়ঙ্কর চারপাশের মানুষের একদিনের ব্যবহারেই আগুন বুঝতে পেরেছিল। ঢাকায় পাড়ি দিয়েও নিস্তার নেই। একদিনের জন্য হলেও সে পতিত ছিল, গ্রামীণ রেওয়াজ সম্পর্কিত আত্মীয়রা এসে শুনিয়ে যায় তাকে নিয়ে গাঁয়ে ছড়া বাঁধা হয়েছে-

> আগুন বিবি ঢাকায় যায়
>
> তিন নাগর তার ডিঙ্গি বায়।[১]

আগুন ঢাকায় এসেই টের পায় সেলিম তাকে তার ব্যবসা সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছিল তা ঠিক নয়। তবু তার প্রতি সেলিমের দায়িত্ববোধ, যত্ন তার সব বেদনা, অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দিয়েছে। তারপরও দেড়রুমের বদ্ধ বাড়ীতে মাঝে মাঝে তার দম আটকে আসে, অন্যদিকে দিন দিন সেলিমের মুখ বিষন্ন হতে থাকে। আগুন বুঝতে পারে সেলিমের ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না। এর মধ্যেই হাসপাতালে তার একটি মৃত আরেকটি জীবিত সন্তান জন্মায়। সেলিম চিন্তিত, নিজেদেরই চলে না সন্তানকে কী খাওয়াবে। সন্তান জন্মের দ্বিতীয় দিন সেলিম হাসপাতালে আসে একহালি কলা নিয়ে। সে জানায় বাসাটা ছেড়ে দিয়েছে। আগুনকে সান্ত্বনা দেয় আরেকটি ভালো বাসা নেবে বলে। এর পরদিন আসে খালি হাতে। এর পরের দিন আসেই না। চরম অনিশ্চয়তা আর অসহায়ত্বে বুক হিম হয়ে উঠে আগুনের। পেটের সন্তানকেই প্রবল শত্রু মনে হয় তার।

> ইচ্ছা করে ধাক্কা মেরে বিছানা থেকে ফেলে দিতে। পরক্ষণে জড়িয়ে ধরে গভীর মমতায়। বিড় বিড় করে, তুই আমার সাহস। তুই একটা পুরুষ মানুষ। তোকে নিয়ে পাড়ি দেবো বাকি জীবন।[২]

Dhaka University Institutional Repository

দু'দিন পরে গা নীল হয়ে এসে ছেলের মৃত্যু হল। অকুল সাগরে পড়ল আগুন। এ সময় হাসপাতালের আয়া জিদ্দিবু বা জাহেদা বিবি এগিয়ে এলেন তার সাহায্যে। জিদ্দিবু সন্তানহীন বিধবা, তেজী মানুষ, একা থাকেন। তার ওখানেই ঠাঁই হয় আগুনের। এত বড় শহরে অসহায় বোধ করে সে। সাহস জোগায় জিদ্দিবু। শোনায় তার নিজের জীবনের গল্প। দুদিনের জ্বরে হঠাৎ স্বামী মারা যান তার। মনে হয়েছিল তিনি বোধ হয় নিজেই মারা গেছেন। কাঁদতে কাঁদতে মনে হয়েছিল তিনি আসলে নিজের জন্যে কাঁদছেন।

> কারণ মন জানত দালান থেকে পথে নামতে হবে, তাই কান্না।[৩]

আগুন জানতে চায় তার মত তেজী মানুষকে ঘর ছাড়া করল কিভাবে? জবাবে জিদ্দি জানান-

> ক্যান আইন। বাঁজা মেয়েলোক থাকা খাওয়ার অধিকার পায়, সয় সম্পত্তি কি বা পায়? শ্বশুড়ের ঘরে বান্দীর সুরতে জীবন পাড়ি দেওয়া যেতো। মেজো দেবর নিকার প্রস্তাবও দিয়েছিলো। কিন্তু চিত্ত চায় নাই। ভাইদের একটা প্যাটের খানাদানা দেবার সঙ্গতি আছিলো। কিন্তু গোলেমালে বান্দীর কামটাই হতো আসল। মা খালার দুর্দশা দেখে ঐ সার বুঝেছিলাম। তাই বাসে চড়ে চলে এসেছিলাম এই টাউনে। তোর মত শিক্ষিত না হলেও একেবারে বকলম ছিলাম না। আয়ার চাকরি জুটে গেল। কারু বোঝা হতি হলো না।[৪]

আগুন একসময় জিদ্দিবুর ঘর দোর সামলায়। জিদ্দিবুর এনে দেয়া পুঁতিমতির মালা গাঁথে। এই জীবনে স্থিত হয়ে উঠে সে। রেডিওর নবঘোরায়, টিভি দেখতে ইচ্ছে করে। টের পেয়ে জিদ্দিবু সতর্ক করে-

> স্বপ্নের গরুর দড়ি শক্ত হাতে টান।[৫]

একসময় হাসপাতালের নার্সদের ধর্মঘট হয়। জিদ্দিবু দুতিনদিন হাসপাতাল থেকেই ফিরতে পারে না। তাছাড়া জিদ্দিবু নিজেও কর্মচারী ইউনিয়ন করে, বিপক্ষ দলের সাথে বিরোধ তীব্র হয়। এক সময় লাঞ্ছিত হয় জিদ্দিবু। অবস্থা বেশী গোলমেলে দেখে আগুনকে এখানে রাখা নিরাপদ মনে করে না জিদ্দিবু। হাতে একশ টাকা দেয় আর একটা কাগজে ঠিকানা দিয়ে পথের দিশা দিয়ে বলে–

Dhaka University Institutional Repository

> সে আমার ধর্মের বোইন। ঘরে জাগা পাবি কাজ কাম খুঁজবি ....খালি সাবধানে থাকবি। এই টাউনে গুন্ডা বদমাইশরা জোঁকের মতন কিলবিল করতাছে। তাগো হাতে য্যান পড়বি না আবার।[৬]

অনেক গলিঘুচি পেরিয়ে জায়গায় পৌছায় আগুন। গিয়ে পায় জিদ্দিবু'র ধর্ম বোন হেলালীকে। হেলালী সেজেগুজে সিনেমার কাজে বেরুচ্ছে। এর মধ্যেই জানিয়ে দেয় যে সে বিবাহিত, একটা ছেলে আছে, নাম বাবলা। স্বামী সপ্তাহে একদিন আসে। সে দিন আগুনকে অন্য কোথাও থাকতে হবে। হেলালীই ব্যবস্থা করবে। দ্রুত কথাগুলো বলে সে। নুরার মা তার ছেলের দেখাশুনা করে, তাকে চাবি খুলে আগুনকে ঘরে ঢুকতে দিতে বলে সে দ্রুত চলে যায়। এর মধ্যে আশেপাশের ঘর থেকে বেড়িয়ে আসা উৎসুক মানুষ তাকে ঘিরে ধরে-

> আগুনের মনে হয় সে যেন ঝড়ের রাতে বাসা থেকে পড়ে যাওয়া ছালবাকল ছেলা সেই পাখির ছানাটি। যাকে ঘিরে বাচ্চা বয়েসে তারা হৈ চৈ করতো।[৭]

নুরার মা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। এসময় রুগ্ন বছর সাতের একটা ছেলে ঘরে ঢুকে গরম ভাতের জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে। নুরার মা বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে পান্তা ভাত খাইয়ে বাইরে পাঠায়। আগুন বুঝতে পারে এ-ই হেলালীর ছেলে। ছেলেটির খেয়ে যাওয়া পান্তা ভাতের পানিটা লবণ দিয়ে নুরার মা তাকে দিলে সে গোগ্রাসে গিলে ফেলে। শুরু হয় আগুনের আরেক জীবন।

হেলালীর স্বামী এলে মই বেয়ে আগুন আর বাবলাকে উঠে যেতে হয় চালে। চালে উঠে দেখে শুধু তারা না, আরো অনেকে এই চালে রাত কাটাচ্ছে। রূপজানের দাদা দাদী, খুকীর কিশোর দুই মামা চাচা, বাচ্চা কোলে নুরার মার বাচ্চা বিধবা মেয়ে। বাবলার সাথে গল্প করতে গিয়ে আগুন টের পায় জীবন সম্পর্কে এই অল্প বয়সেই অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছে বাবলা। বাবলাই জানায় তার বাবার সাথে মার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এটা তার মার দ্বিতীয় স্বামী।

> একবার আউটডোরে গিয়ে এই ব্যাটার লগে আলাপ। মাস গেল না শাদী। সেই থেইকা মার সব পিরিত গেছে ঐ পাওলান ব্যাটার দিকে।[৮]

মায়ের এই দ্বিতীয় স্বামী সম্পর্কে বাবলা যখন বলে–

Dhaka University Institutional Repository

> সপ্তাহে একদিন আসে। আমার দিকে ফিরাও চায় না। য্যান ঐ ঘরের তেওলাচোরা টিকটিকি আমি। চাইলেও চলে, না চাইলেও চলে এমন।[৯]

তখন আগুনের মনে হয়, বয়স নয় অভিজ্ঞতাই মানুষকে কথা বলায়।

এক অদ্ভূত জীবন স্রোত বয়ে চলেছে এই বস্তিতে। জোছনা সিনেমার এক্সট্রা। স্বপ্ন দেখে নায়িকা হওয়ার। দু সতীনের ঘর তার। একদিন সে থাকে স্বামীকে নিয়ে সতীন চালে, আরেকদিন সতীন থাকে স্বামীকে নিয়ে সে চালে। এই নিয়ে ওর দুঃখ নেই। ওর দুঃখ হয় তখন যখন অনেক খেটে খুটে সে যেটুকু অংশ সিনেমায় অভিনয় করে সেই অংশটাই কাঁচিকাটা হয়ে যায়। এই জোছনার অনুরোধে তার ফুপাতো ভাই আগুনের জন্য গার্মেন্টসে একটা চাকরি জোগাড় করে দেয়। থাকার জন্য একটা ঘরও, ফ্যাক্টরীর আরো দুই কর্মীর সঙ্গে। বিদায় বেলায় বাবলার জন্যেই কষ্ট হয় আগুনের। ছেলেটার দুঃখের সময়ের সঙ্গী ছিল সে। হাপুস নয়নে কাঁদলো বাবলাও। নতুন চাকরি, নতুন ঘর। ঘরে সঙ্গী দুজন, মনাক্কার মা ও ঐশ্বর্য। মনাক্কার মা বিধবা। ছেলে বিয়ে শাদী করে ভিন্ন থাকে, মায়ের খোঁজ নেয় না। মেয়েটা এক চাকরিতে বেশী দিন থাকতে পারে না। চাকরি না থাকলে মার কাছে চলে আসে বলে ভয়ে ভয়ে থাকে মা, ভাবে কখন মেয়ে এসে ঘাড়ে সওয়ার হয়।

ঐশ্বর্য ১৭/১৮ বছরের মেয়ে। আগুন যে গার্মেন্টসে চাকরি পেয়েছে সেখানে ঐশ্বর্যও চাকরি করে। এখনও হেলপার, সামনেই প্রমোশন হবে। ওর কাছ থেকে জীবনের অনেক পাঠ নেয় আগুন। মাঝে এক ফালি উঠান রেখে চারিদিকে মুলি বাঁশের ঘর আর ঘর। এক চিলতে পাকের চালা। তার ভিতর বারোয়ারি চুলা। সেটার দখল নিয়ে খোঁচাখুচি লেগেই আছে, কলতলাটাও তাই। ভালো লোভনীয় কেবল একটা ব্যাপার। সন্ধ্যের পর বাড়িওয়ালা রঙিন টেলিভিশন বের করে দেয়। সব ঘর থেকে দেখা যায় বসিয়ে দেয় এমন এক কৌণিক বৃত্তে।

ঐশ্বর্য বাবা মার বড় সন্তান। বেতন পেলেই বাবা মার জন্য টাকা পাঠাতে হয়। ঐশ্বর্য কৌতুকের গলায় জীবনের অনেক কঠিন সত্যকে লঘু করে বলতে পারে। মা-বাবাকে নিয়ে, নিজেকে নিয়ে অনেক কথা বলে আগুনকে-

> পয়সা জমাচ্ছি। বাপ-মাকে কিছু জমি-জমা কিনে বলবো, গেট আউট। এবার আমায় রেহাই দাও।..... এখন একটু উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি, তখন স্থির হবো।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

উড়ে উড়ে বেড়ানোর রহস্য পরিষ্কার হয় কিছুদিন যেতে না যেতেই। ঐশ্বর্য প্রায় ছুটির রাতে ঘরে ফেরে না। প্রেমিকের সঙ্গে ডেটিং করতে যায়। রাখ ঢাক নেই। দিব্যি বলে,

> শরীর থেকে কি খসে যাচ্ছে মাংস? বরং মরে মরে না, জ্যান্ত জ্যান্ত বেঁচে আছি। পেটের দানার মতো দেহের খানাও চাই।
>
> পয়সা নাও?
>
> ধ্যাৎ, আমি কি বাজারের বেশ্যা। খাতির হয়, প্রেম হয় তারপর না রাত কাটাই।
>
> ..... আজকালকার প্রেমিকরাও তো নিমকহারাম। বিয়ে পর্যন্ত টিকতে চায় না। তো যে আমার কপালে লাথি মারে আমিও তার পাছায় লাথি মেরে, মুখে থুতু দিয়ে হায়-পিত্যেশ না করে আর একজন জুটাই। উপহার ভালোই পাই। মেকআপের সাজসরঞ্জাম খুব আক্রা। জামা কাপড়ও গাঁটের কড়ি ভেঙ্গে কিনতে হয় না।
>
> .....হোটেল খাওয়া সিনেমা দেখার খর্চা যে ভূত যখন থাকে সেই যোগায়।[১১]

এই জীবনের সাথে নিজেকে মিলাতে না পারলেও আগুন মানিয়ে নিয়ে ভালোই থাকে। এর মধ্যেই একদিন জিদ্দিবু ইলিশ মাছ আর একটা পুরনো হলেও ভালো শাড়ী নিয়ে দেখা করতে আসে আগুনের সাথে। তার কাছ থেকেই শুনে, সেই আরমান যে জিদ্দিবুকে সকলের সামনে বেইজ্জত করেছিল তাকেই একদিন চরম শায়েস্তা করেছে জিদ্দিবু। এখন আর লাগতে আসে না। হেলালী সিনেমার নায়িকা হয়েছে। জোছনার এখনও কিছু হল না বলে খুব মন খারাপ করে থাকে। রাতে খাওয়া দাওয়া করে ফিরে যায় জিদ্দিবু। আগুনের মনে হয় যেন তার খুব কাছের কেউ চলে যাচ্ছে। আগুন বার বার আরমানের কাছ থেকে সাবধানে থাকতে বলে জিদ্দিবুকে।

চারপাশের পুরুষদের চোখে কুৎসিত চাহনিতে আগুন বিব্রতবোধ করে–

> কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে যায় সে স্বামী পরিত্যক্তা। কুমারী মেয়েদের ওরা যতটা না জ্বালায়, তার চেয়ে অনেক বেশী উৎপাত করে স্বামী ছেড়ে যাওয়া মেয়েদের। .....একবার যে নারী স্বামীর স্বাদ পেয়েছে, পুরুষের জন্য তার আগ্রহ থাকে। .....সেই সুযোগটাই নিতে চায় নানা ছলে বদমাশ স্বভাবের মানুষগুলো।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

মাঝে মাঝে তার সেই দুই দিনের ছেলেটার কথা মনে হয় আগুনের। বুকের ভিতর কেমন মোচড় দিয়ে উঠে। যদিও এও মনে হয় মরে গিয়ে ছেলেটা মাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। তবুও মাঝে মাঝে খুব মৃত্যু চিন্তায় মগ্ন থাকে আগুন।

> যেন এক ধরনের মুক্তির আশ্বাস। মনে হয় মরা নয় বেঁচে যাওয়া।[১৩]

মৃত্যুর কথা ঐশ্বর্যকে ভাবাবেগে বলে ফেলতেই সে প্রতিবাদ করে–

> এখানে এসে ইঁট ভাঙতে হয়নি, চাকরানী হয়ে বাসন মাজা, খানকী পাড়ায় নাম লেখা, কোনটাই নয় একেবারে চাকরিতে ঢুকেছি। আমরা হচ্ছি চাকুরে।[১৪]

ঐশ্বর্য, আগুন দুজনেরই প্রমোশন হয়। আগুন মাকে চিঠিতে জানায় দু একমাস পরে মাকে নিয়ে আসবে ঢাকায়। এসময় তাদের গার্মেন্টসে ঘটে যায় বিরাট দুর্ঘটনা। গার্মেন্টস মালিকের বিরোধী পক্ষ দিনের বেলায় মালিককে ঘরে তালাবদ্ধ করে তছনছ করে দিয়ে যায় সব। যন্ত্রপাতিও ভেঙ্গে দিয়ে যায়। তালা পড়ল গার্মেন্টসে। অনির্দিষ্টকালের জন্য গার্মেন্টস বন্ধের নোটিশ হয়। তারা সবাই আপাতত চাকরিহারা। বিপর্যস্ত বোধ করে আগুন। কী করবে সে? গ্রামে ফিরে যাবে? কিন্তু মা যেখানে জানিয়েছেন ঢাকা আসছেন তখন সে কেমন করে গিয়ে বাড়ীতে উঠে? অলৌকিক কিছু ঘটার জন্য প্রার্থনা করে সে। দুদিন পরে অলৌকিক কিছুই যেন ঘটে, হাতে চিরকুট, বগলে ইয়া বড়ো একটা মিষ্টি কুমড়া নিয়ে হাজির হন মা মরিয়ম। পিছনে সেলিম। জিনস, খয়েরী গেঞ্জি পরা পরিপাটি চুলের সেলিম। কৈফিয়তের সুরে জানায় হঠাৎ করে এক দালালের পাল্লায় পড়ে তাকে চলে যেতে হয় সিঙ্গাপুরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে বুঝে সব আদম ব্যাপারীর কারসাজি। ওদের বিপাক দেখে ওখানকার বাঙালীরা চাঁদা তুলে দেশে ফেরত পাঠায়। দেশে এসে ব্যবসা শুরু করে এখন ভালই অবস্থা। আগুনকে অনেক খুঁজেছে, পায় নি। শেষে গ্রামে গিয়ে আগুনের মায়ের কাছে হাজির হয়েছে। আগুনের মার ঢাকায় আসার কথা শুনে তার সাথে আগুনকে নিতে চলে এসেছে এখানে। ঐশ্বর্য সব শুনেও তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। জিজ্ঞেস করে বিদেশ যাওয়ার টাকা কোথায় পেলো। আগুনের গ্রামের বাড়ীতে তার সংবাদ জানিয়ে একটা চিঠি অন্তত লিখতে পারত। কিন্তু সেলিমের আসার আনন্দে এসব প্রশ্নের উত্তর যেন তলিয়ে যায়। সন্ধ্যের দিকে সেলিম বেবিটেক্সি নিয়ে আসে বউ শ্বাশুড়ীকে নিয়ে যাবার জন্যে। বস্তির সবাই দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

শহরের বাইরে হলেও সেলিমের বাড়ী বেশ বড় এবং সুন্দর। স্বপ্নের মত মনে হয় আগুনের কাছে। তার মৃত ছেলের কথা আবার খুব মনে পড়ে। সেলিমকে কথাটা বলতেই সেলিম বলে,

অমন ছেলে নিজেরা বাঁচলে অনেক আসবে। মন খারাপ করো না।[১৫]

সেদিন রাতে ঘরের আলো বন্ধ করে সেলিম একটু সিগারেট খেয়ে আসি বলে বেড়িয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলে মদের কটু গন্ধ নাকে আসে আগুনের। বস্তিতে থেকে এ গন্ধের সাথে পরিচিত হয়েছে সে। জানালা বন্ধ বলে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে যে তাকে জড়িয়ে ধরল সে অনুভব করে এ সেলিম নয়। কে কে বলে চিৎকার করতেই মোটা ভাঙ্গা চাপা চাপা স্বরে জবাব আসে,

তোর সোয়ামী তাহলে চিনায়ে যায় নাই আমারে। ও শালা জন্ম বেঈমান।[১৬]

এরপরে সেই লোকই জানায়, সেলিমের বিদেশ যাওয়ার বিষয় সবই মিথ্যা। সেলিম এখনও বেকার। সেলিমের বউ আছে শুনে এই লোকই পরামর্শ দেয় বউকে নিয়ে আসার জন্য। বাজারের মেয়ের চেয়ে ঘরের বউয়ের স্বাদই আলাদা। সব শুনে তার ভিতরের আগুন তীব্রভাবে জ্বলে উঠেছে। সেলিম তার বিশ্বাসের এই মূল্য দিয়েছে। গায়ের জোরে এ লোকের সাথে পেরে উঠবে না, মনে পড়ল জিদ্দিবুর কৌশলের কথা।

আগুনের চতুর তীব্র অন্ডকোষ আক্রমণে মেঝেতে পড়ে গোঙ্গাতে লাগল মাতালটা।[১৭]

আগুন ছুটে বেড়িয়ে এসে চিলেকোঠার মত ঘর থেকে মাকে টেনে বের করে এনে রাস্তায় নামে। নিশুতি রাত, এখানেও নিরাপদ নয় সে। তাই পাশেই একটি হাসপাতাল দেখে মাকে রোগী সাজিয়ে সেখানেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয় আগুন–

তার পর ফিরে যাবে সেই ঠিকানায়, বিকালে যেখান থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিল।[১৮]

এভাবেই উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন রাবেয়া খাতুন। অল্প কিছু কাহিনী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে আগুন চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের সমাজে মেয়েদের অসহায়ত্বটাকে গভীর মমতা দিয়ে অঙ্কন করেছেন তিনি। অন্য দিকে আগুন, জিদ্দিবু, ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে নারীর লড়াইটাও রূপায়িত হয়েছে এ উপন্যাসে। জীবন সম্পর্কে ঐশ্বর্যের অভিজ্ঞতালব্ধ ভাষ্য, জীবন ও যৌনতা বিষয়ে যেন নতুন এক জীবনসত্যকে উপস্থাপন করেছেন রাবেয়া খাতুন।

Dhaka University Institutional Repository

নাসরিন জাহান

ক্রুশকাঠে কন্যা

১৯৮০-এর দশক থেকে বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প বিকাশের সাথে সাথে 'গার্মেন্টসের মেয়ে' নামে যে মেয়েদের আমরা দেখতে পাই তাদের দিকে সমাজ তাকায় এক বিশেষ দৃষ্টিতে। প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই গার্মেন্টসের মেয়েদের ধর্ষিত, লাঞ্ছিত হওয়ার সংবাদ আর পুড়ে মরার ছবি। সমাজে এই নিয়ে বিশেষ আলোড়ন, প্রতিবাদও তৈরী হয় না। অথচ এদের শ্রম আর ঘামেই অর্জিত হচ্ছে যে বৈদেশিক মুদ্রা তার হিসেব দেয়া হয় উচ্চস্বরে, গর্বিত ভঙ্গিতে। এই গার্মেন্টসের মেয়ের ঘাম শ্রমের কষ্টকর ক্লেদাক্ত জীবন, সমাজে তার নীচু অবস্থান, সহজভোগ্য হিসেবে দেখার বিকৃত এক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, দুমুঠো অন্ন সংস্থানের নিদারুণ কঠিন সংগ্রাম এবং এরই মধ্যে তাদের স্বপ্ন ধারণের কষ্টকর প্রচেষ্টাকে অনাপোশ ঋজু ভাষায় অঙ্কন করেছেন নাসরিন জাহান তাঁর 'ক্রুশকাঠে কন্যা' উপন্যাসে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলুফার জন্ম মুহূর্তেই জেনেছে তার জন্মটা কতটা অনাকাঙ্ক্ষিত তার পিতা ও সমাজের কাছে। তার মার কাছে সে জেনেছে তাকে গর্ভেই মেরে ফেলার জন্য বাবা কত গাছের রস, কত গরম জল মাকে খাইয়েছেন। এক রাতে মায়ের পেটের উপর ভয়ানকভাবে চেপে বসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন পেটের সন্তান মেয়ে হবে তা তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। মায়ের কাছ থেকে নীলুফার জেনেছে তার জন্মের পরে –

> মা'র কোল থেকে খাবলা মেরে নিয়ে বাবা আমাকে বিছানার উপর ঝপাৎ শব্দে ফেলে দিয়েছিলেন।
>
> শুনতে শুনতে ভুলে গিয়েছিলাম জন্মের স্বাদ কী, মৃত্যুর ভয় কী? ঘৃণা কী, আনন্দ কী। জেনেছিলাম পৃথিবী শাসন করছেন ভয়াল শক্তির অধিকারী সৃষ্টিকর্তা, এরপর আমাদের জীবনের অধিকর্তা আমাদের জনক। তার ভ্রূণে আমাদের জন্ম বলে তিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে যা খুশী তাই করার ক্ষমতা রাখেন, আমরা বাবাকে সেইভাবেই নিয়েছিলাম।[১৯]

নীলুফারের মা তার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার মাকে বিয়ে করেছিলেন-

Dhaka University Institutional Repository

> তখন মার বয়েস আর কত? চৌদ্দ। দরিদ্র পরিবারে কোরআন খতম আর দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে পাঠ চুকিয়ে ফেলা, এই ছিল মার যোগ্যতা। আজন্ম খেলার সাথী জালালকে কেন্দ্র করে মার মধ্যে সবেমাত্র স্বপ্ন জমতে শুরু করেছে তখন। গোঁফআলা, বুকে লোমের ইয়া বড় পুরুষ বাবাকে বিয়ে করাটা ছিলো মার জীবনের প্রথম ভয়। মা-কে বিয়ে করে নিয়ে বাবা শহরের বাসে উঠেছেন, দূরে সজনে গাছটার নিচে জালাল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্যের বর্ণনা মা যতবার দিয়েছেন, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তার চোখ ভিজে উঠেছে।[২০]

এরপর শুরু হয় নীলুফার মার দোজখবাস–

> অসহ্য এক বোবা প্রাণীর মত তিনি দিনের পর দিন বাবার অশ্লীল গালিগালাজ, বেদম প্রহার, এই সব সহ্য করে গেছেন। বাবার মাকে ঘায়েল করার প্রধান অস্ত্র ছিল মার দারিদ্র্য। প্রায়ই বাবা মাকে ফকিন্নীর ঝি বলে সম্বোধন করতেন। বলতেন অচল মাল গছিয়ে দিয়ে নানা তার সাথে প্রতারণা করছেন। কিসে মা অচল এই বিষয়টা কোন দিন মা বুঝে উঠতে পারেন নি। তবে কি কি জিনিষ দেবে বলে নানা সে সব তাকে দেয় নি সারা জীবন বাবার আক্রোশের ওটাও একটা মূল জায়গা ছিল। মাকে বাবা তার পরিবারের সাথে চির জীবনের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করিয়েছিলেন। এরপর একের পর এক কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে সংসারের মধ্যে শেষ জায়গাটাও নষ্ট হয়ে যায়। বাবা বলতেন একটা ছেলে যদি থাকতো, ফকিন্নীর ঝি জন্মাইছে একটা পচা পেট লইয়া, মাইয়া ছাড়া কিছু বিয়াইতে জানে না। মা নিজেও বাবার দেয়া এসব বিশেষণ বিশ্বাস করে এমন ভীত, এমন সংকুচিত থাকতেন, তাতে বাবার ক্রোধ তিনগুণ বেড়ে যেত। বাড়া ভাতে লাথি দিয়ে তিনি বলতেন, ওই খানকী, জবাব দেসনা ক্যান? তুই বোবা নাহি?[২১]

এভাবেই জীবনের শৈশবকে দেখে নীলুফার ও তার বোনেরা। পাঁচ নম্বর সন্তানটি কন্যা হওয়ায় তার বাবা তাদের ছেড়ে ছেলে সন্তানের আশায় আবার বিয়ে করেন। সেদিন তাদের মা এই বড় সংসারের চিন্তায় যখন আকুল হয়ে কেঁদেছেন, তখন বোনরা হয়েছে আনন্দিত। বাবা ঘরে ঢুকলেই বাড়ীতে নেমে আসত কবরের নিস্তব্ধতা। বাবা চলে যাওয়ার পরে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে সায়রা বু বলেছিল প্রয়োজনে শরীর বেচবে। দ্বিতীয় বোন দিলারা বলেছিল টিউশনী করবে। নীলুফার নিজে বলেছিল পাতা কুড়িয়ে বেচবে। ছোট শায়লা বলেছিল ভিক্ষা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

শুরু হয়েছিল তাদের বাবাহীন জীবন। সে জীবনে কিছুদিন পরেই প্রবাস থেকে এসে যুক্ত হয়েছিলেন মার দূর সম্পর্কের ভাই শওকত মামা। দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাদের পুরো পরিবারের। শওকত মামার সাথে বসবাসের দিনগুলোও ছিল তাদের সবচেয়ে আনন্দের। তার স্নেহ, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এ সবই তারা উপভোগ করতো। শওকত মামার সাথে মায়ের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই নিয়ে পাড়াপ্রতিবেশী থেকে শুরু করে বড় বোনরাও মায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ হয়ে উঠে। কিন্তু নীলুফার এতে মার কোন দোষ খুঁজে পায় না। তার মনে হয় শওকত মামা এতো কিছু দিচ্ছেন বিনিময়ে কিছু চাইতেই তো পারেন। তার মা বাবার সাথে সে জান্তব জীবনযাপন করেছেন তার চেয়ে ভালো এটা। তাছাড়া সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে–

আমি তো দেখেছি নিজেকে বিকাতে গিয়ে কি অসহ্য ক্রন্দনের মধ্যে মা পড়েছিলেন।[২২]

এ সময় নীলুফারই হয়ে উঠে তার মায়ের একান্ত নিকটজন। মায়ের জীবনের সকল কষ্টকে প্রবল সহানুভূতি দিয়ে দেখে তাঁর পাশে দাঁড়ায় নীলুফার। মা ধীরে ধীরে শওকত মামার প্রেমে পড়েন। মায়ের সেই ভাললাগার তরঙ্গ নীলুফারকে প্রবল আনন্দ দিত। মনে হত, মার জীবনের সবটাই তাহলে অর্থহীন হয়ে যায় নি। শওকত মামা এত বড় একটা সংসারের ভার মাথায় নিয়েছিলেন, তার জোয়ান মেয়েগুলোর দিকে হাত বাড়ান নি এতেই এক প্রবল কৃতজ্ঞতা অনুভব করতেন মা শওকত মামার প্রতি। এক সময় শওকত মামা বিয়ে করে সংসারী হোন। যে অল্প কিছু টাকা পাঠাতেন বাবা তা দিয়ে তাদের চলত না। নীলুফার বড় দু'বোনও তাদের মতো বিয়ে করে চলে যায় এ সংসার ছেড়ে। একরকম বাধ্য হয়েই নীলুফার ও শায়লা, একজন বি.এ. পড়া অবস্থায় ও একজন মেট্রিক পাশ করে, শহরে এসে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ী উঠে চাকরীর সন্ধানে। কিন্তু সে বাড়ীতে বেশী দিন থাকা সম্ভব হয়নি তাদের।

এক সময় বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে দুই বোনই চাকরী নেয় গার্মেন্টসে। শুরু হয় তাদের টিকে থাকার কঠিন নির্মম লড়াই। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত একটানা কাজ। বাথরুমের জন্য দশ মিনিট আর খাবারের জন্য আধাঘন্টা এই তাদের বিরতি। বাথরুমের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে দেরি হয়ে গেলে চিৎকার চেঁচামেচি। কাজের মাঝখানে ক্লান্তিতে মাথা নুয়ে পড়লে পিঠে স্কেলের বাড়ী। কাজে ভুল করলে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রোডাকশন ম্যানেজার চাকরি যাওয়ার ভয় দেখিয়ে শরীর পর্যন্ত ভোগ করে। এক মুহূর্ত ফাঁকির বদলে বেতন কাটা এক অসহনীয় পশুর জীবন। অথচ অস্তিত্ব টিকানোর প্রয়োজনে এই চাকরী রক্ষা করতেই তাদের মরণপণ চেষ্টা।

Dhaka University Institutional Repository

একবার শায়লা, নীলুফার দুজনের এক সাথে চাকরি চলে যায়। ঘর ভাড়া বাকি, মুদির দোকানের দেনা অনেক, এরকম সময়ে বাড়ীওয়ালা বাড়ী থেকে বের করে দিলে শরীর বিক্রির কথাও চিন্তা করে শায়লা। নিজেদের জিনিষপত্র নিয়ে ভোর বেলা সেই পুরনো দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাসায় যাওয়ার জন্য পথে নামলে দুজন পুলিশ তাদের পথ আগলায়। পুটলিতে কি আছে তা দেখানোর কথা বললে শায়লা জোয়ান পুলিশটার হাত ধরে একটা ভাঙ্গা প্রাচীরের আড়ালে চলে যায়। ফিরে এলে তারা রওয়ানা হয়। এই ঘটনায় নীলুফারের সমগ্র অস্তিত্ব যেন প্রবল বেগে নাড়া খায়।

তার একেবারে তরুণী বয়সে রঞ্জন নামে যুবকের আগমন ঘটেছিল নীলুফারের জীবনে। প্রথম দেখাতেই তার মুখে রক্ত জমে উঠেছিল। কুণ্ঠিত সে। তার কথা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। যুক্তিহীনভাবে রঞ্জনের প্রতি প্রবল প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এরপর থেকেই কেমন একটা ঘোরের জগতে ডুবতে থাকে সে। এই ক্লেদাক্ত জীবন যাপনের সময়ও তার সেই অলৌকিক স্বপ্ন মদিরগন্ধ সেই বিষাক্ত বেদনা তাকে আবিষ্ট করে রাখে। রঞ্জনের হাত ধরেই সে প্রবেশ করেছিল 'দিবারাত্রির কাব্য'র হেরম্ব, 'উভচর মানব'-এর ইকথিয়াান্ডার আর 'আন্না কারনিনা'-র ভ্রুনস্কি বা লোভনের জগতে। এই জগত তাকে উজ্জীবিত করেছিল ভিন্ন এক উচ্চতর শক্তিতে। গার্মেন্টসের প্রথম দিককার জীবনবাস্তবতায় তার সে শক্তি যেন ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু এক সময় এই চাকরী যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন ঐ শক্তির জোরেই রাত আটটা দশটায় গার্মেন্টস থেকে ফিরে সারারাত পড়ে আবার সকালে গার্মেন্টসে গিয়ে ঢুকতো।

এক সময় ডিগ্রী পাশ করে এক পত্রিকা অফিসে চাকরী নিয়ে এই ভয়ানক জীবন থেকে মুক্ত হয় সে। শায়লা রয়ে যায় গার্মেন্টসের চাকরীতেই। তারা ভদ্রস্ত একটা বাড়ীতে উঠে আসে। দোতালায় দুটো ঘর একটি বারান্দার একটুকু নিশ্চিন্ত জীবন। বাবা বাড়ী বিক্রী করে দিলে মাও ঢাকায় চলে আসেন তাদের কাছে। নীলুফার চাকরি শেষে বিকেলেও টিউশনী নেয়। বাড়ীওয়ালা বিদেশে চলে গেলে তাদের টেলিফোন লাইনটা দিয়ে যান নীলুফারদের। শায়লা খরচ বাড়ার ভয়ে টেলিফোনটা নিতে না চাইলেও নীলুফারই জোর করে নেয়। এ সময় হঠাৎ একদিন মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুতে নীলুফারের চৈতন্যে বিরাট আঘাত লাগে। ঘিরে ধরে মায়ের হাজার স্মৃতি।

মা নিজেই বানিয়ে বানিয়ে টেনে টেনে গান গাইতেন– আয় সখী কন্যাগো, জননীগো, সখী বোন...আয় আয়। অনেক আগে একদিন দুপুরে ঘুম ভেঙ্গে যায় নীলুফার। মাকে পাশে না পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শুনতে পায় গোঙ্গানীর শব্দ। পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে চমকে উঠে সে। বাবা মার

Dhaka University Institutional Repository

উপর বসে মার গলা চেপে ধরেছেন, মা বলে সে চিৎকার করে উঠে। মুহূর্তে বাবার ছিটকে যাওয়া দেহ থেকে মার নিশ্চল অস্তিত্ব মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। সেদিনই আসলে মার মৃত্যু দেখেছিল নীলুফার। হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে এসেছিলেন মা। পূণর্জন্ম হয়েছিল তাঁর। ফের বাবার সংসার গারদে ঢুকে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেদিন থেকে নীলুফার অস্তিত্বে ঢুকে গিয়েছিল এক হিম নিঃসঙ্গতা। সেই নিঃসঙ্গতায় মা-ই ছিলেন তার একমাত্র ছায়া। তবু তার মনে হয়–

> এক ভয়াল অচেনা পথ ধরে অলৌকিক কোন গোপন গুহার দিকে হেঁটে চলেছেন আমার চির বঞ্চিত, অসহায় যন্ত্রণাকাতর মা। মৃত্যু যাঁকে বাঁচার নিষ্কৃতি দিয়েছে।[২৩]

সে দেখেছে তার বাবার পশুত্বের চেয়ে মায়ের অসহায়ত্বের সম্পর্ককেই বেশী ধিক্কার দিয়েছে সমাজ। এমনকি রঞ্জনও যখন বলে বারো বছর বয়সে কেউ ভোগ করেছে তাকে এই কথা শুনে এবং তার মায়ের কুৎসার কারণে নীলুফারকে নিয়ে তার পরিবারের সামনে দাঁড়ানোর সাহস পায় নি সে। সেদিন এক প্রগাঢ় বেদনায়, সামাজিক মানুষের নিষ্ঠুরতায়, তার হৃদয় মুচড়ে উঠেছিল।

পত্রিকা অফিসের অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। বেতন পেতে পেতে মাসের শেষ হয়ে যায়। শায়লাদের গার্মেন্টসেও শুরু হয়েছে আন্দোলন। শায়লা খুব বাস্তববাদী মেয়ে। নিজের অস্তিত্বের সংকট বিষয়ে সে অনেক সচেতন। তবু কি করে এই আন্দোলনে সে খুব উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। মিটিং-এ অংশ নেওয়ার জন্য হাফবেলা কাজ করে শহীদ মিনারে যায়। নীলুফার শহীদ মিনারে পৌঁছে দেখে শায়লা বক্তৃতা দিচ্ছে। শায়লা গার্মেন্টসের মেয়েদের বেতন ভাতার কথা, নিরাপত্তার কথা আবেগময় ভাষায় বলে যাচ্ছে। এই শায়লাকে যেন নীলুফার চিনতে পারে না। কিছুদিন আগেই গভীর রাতে শায়লা আর শামীমা যখন গার্মেন্টস থেকে বেশ রাতে বাড়ী ফিরছিল দুজন টহল পুলিশ তাদের পথ রোধ করে। শায়লার আইডি কার্ড থাকায় তাকে কিছু না বলে শামীমাকে বেশ্যা বলে লাঞ্ছিত করে। শায়লা আজ সেই কথা বলেই চিৎকার করে জানতে চায়–

> আপনারাই বলুন আমি কি বেশ্যা? শামীমা কি বেশ্যা? শেষ নিঃশ্বাসটা মেশিনের মধ্যে ঢেলে বাড়ী ফেরার পথে পুলিশ যদি বলে তুই বেশ্যা!! বেশ্যা!! বেশ্যা!! আপনারাই বলেন, আমি এই বাঁচার গ্লানি কোথায় লুকাবো?[২৪]

শায়লার বক্তৃতায় নীলুফার কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। মিটিং শেষে দু'বোন এক রিক্সায় করে বাড়ী ফেরে।

Dhaka University Institutional Repository

পাড়ার ছেলে শায়েদের সাথে নীলুফারের একটা প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয়। রঞ্জনের জন্য তার স্বপ্ন ঘেরা অনুভূতিকে পাশে রেখে আশ্রয়ের আশায়, বাঁচার তাগিদে শায়েদের উপর নির্ভর করতে চায় নীলুফার। নিজেই বলে,

> প্রাণের জায়গায় কিছুতেই ওকে বসাতে পারতাম না বলে ও সেই জায়গাটায় যতবার হাত বাড়াতে চাইতো, ততোবারই জাগতিক বিষয়গুলো ওর সামনে তুলে ওকে আমি এমন একজন মানুষ বানাতে চেয়েছি, আমার প্রাণের অনুভবগুলো যার বুঝার দরকার নেই, যে আমার দেহটাকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিতে পারে।[২৫]

এর মধ্যেই হঠাৎ করে একদিন দেখা হয়ে যায় রঞ্জনের সাথে। নীলুফার এতদিন পরে অনুভব করে এত ঝড়, এতো দহন, এতো যুদ্ধের পরেও কোন পুরুষকে দেখে কম্পিত হওয়ার, অস্থির হওয়ার কিশোরী মনটা এখনও তার মধ্যে সুপ্ত আছে। শায়েদকে নিয়ে বা সহকর্মী আরিফকে নিয়ে প্রাত্যহিকতার যে ছক এঁকেছিল রঞ্জনের আবির্ভাব সে পরিকল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। রঞ্জনের স্বীকারোক্তি– আমি তোমাকে ভালবাসতাম– তার মধ্যে একেবারে ধস নামিয়ে দেয়। রঞ্জনের শরীরী স্পর্শের কথা ভেবেও কেঁপে উঠে সে। এভাবেই তার জগৎ রঞ্জনময় হয়ে উঠে। এ থেকে সে বের হয়ে আসতে পারে না। মাঝে মাঝে দেখা করে রঞ্জনের সাথে। এ সম্পর্ককে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় জেনেও সে এর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। রঞ্জনের পরিবার আছে, সেখানে তার পঙ্গু স্ত্রী, তার প্রতি তার দায়িত্ব কর্তব্য। রঞ্জনের সাথে তার সম্পর্কের কোন পরিণতি সম্ভব নয়। এক অসহায়ত্বের চেতনা ও আশ্রয়ের আকুলতা থেকে আবার শায়েদকে তার জীবনে চেয়েছে সে। তাই তার জীবনের রঞ্জন নামক স্বপ্নের, আর শায়েদের জীবনের পাহাড়ে ডাহুক খোঁজার তীব্র অনুভূতিতে তারা পরস্পরকে চেনে না। তবু সে শায়েদকেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বাবা, মা, শায়রা, দিলারা সহ অনেক দম্পতিকে দেখে তার মনে হয় বিয়ে কখনও স্বপ্নের সাথে সঙ্গম নয়, পাহাড়ের ডাহুক খোঁজা নয়, বিয়ে হলো বাঁচা মরার সাথে সম্পৃক্ত কঠিন বাস্তবতা। যেখানে স্বাপ্নিক মানুষরা ক্রমশ অযোগ্য আর অর্থহীন হয়ে পড়ে। নীলুফার নিজেকে বিয়ের জন্য বৈষয়িক হিসেবে বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে তৈরীর চেষ্টা করে।

অন্যদিকে সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, জিন্নাত আলীর মধ্য দিয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জীবনের আরেক চিত্র অঙ্কন করেছেন নাসরিন জাহান। সারা জীবন সিনেমা জগতের ঝলমলে জগতে বসবাস করে তার যখন পড়তি দশা তখন ওপার থেকে এপারে চলে আসেন সুলেখা, এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেন। একবার তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, তাকে হাসপাতালে নেওয়ার সময়

Dhaka University Institutional Repository

নীলুফার সাহায্য করেছিল। সেই থেকে কিছু হৃদ্যতা। তিনিই বলেছেন তিনি প্রথম বয়েসে যাকে বিয়ে করেছিলেন অল্পদিন যেতেই তার সাথে বসবাসে তিনি আর কোন আনন্দ পেতেন না। তার ধারণা অধিকাংশ স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রেই এটা সত্য, তবে সাধারণেরা আপোশ করে নেয় এই অবস্থার সাথে। কিন্তু হাজার মানুষের স্বপ্নের মধ্যে যার বসবাস একজনের বৃত্তে তার পক্ষে ঐ আপোশ করা সম্ভব হয় নি। তার অনেক পরে তার এদেশে আসা। সেই বাংলাদেশী লোকটাই ছিল তাঁর খাঁটি প্রেমিক। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তিনি সেই লোকের প্রতিও বিশ্বস্ত ছিলেন না। যদিও এ লোকই তাঁকে জীবনের সর্ববিধ নিরাপত্তা দিয়েছেন। তিনি গোপনে যার সাথে সম্পর্ক গড়েছিলেন তিনি নীলুফার অফিসের এম.ডি. লম্পট জিন্নাত আলী। সুলেখার সুপারিশেই নীলুফার জিন্নাত আলীর অফিসের সেই চাকরিটা পেয়েছিল। সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন লোকটা লম্পট, কিন্তু তাঁকে ভালবাসার ক্ষেত্রে তার প্রচন্ড এক গভীরতা ছিল। এ এক নতুন জীবনবোধ। অথচ এই জিন্নাত আলীই নীলুফারকে সামনে বসিয়ে রেখে অন্য মেয়ের সাথে মিলিত হওয়ার মত বিকৃতি দিনের পর দিনে চালিয়ে গেছেন।

এর মধ্যে শায়লার গার্মেন্টসে আগুন লাগে। শায়লা পিঠে পায়ে পোড়া নিয়ে বেঁচে গেলেও পরিচিত অনেকেই মারা যায়। মৃতদের স্বজনদের কান্না, আত্মচিৎকার, উপার্জনক্ষম মেয়ে বোনের মৃত্যুতে পরিবারগুলোর হাহাকারে অসহায় বোধ করে নীলুফার। সরকার ক্ষতিপূরণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হাজারো জটিলতা দেখে সে আরও বিমর্ষ হয়ে পড়ে। শায়লা সুস্থ হয়ে আবার চাকরিতে যোগ দেয়। একদিন বিয়ে করে বরসহ বাড়ীতে আসে। নীলুফার অবাক হলেও খুশী হয়। শায়লা চলে যায় স্বামীর সাথে। আরও একা হয়ে যায় নীলুফার। খরচ চালাতে না পেরে বাড়ীটা ছেড়ে দেয়। মিরপুরে আরও ছোট বাড়ীতে গিয়ে উঠে। অফিসে এম.ডি. তার নামে কুৎসিত এক কুৎসা রটায়। সহকর্মীরা তাকে দেখে টিপ্পনী কাটে। এক বিষাক্ত ক্লেদাক্ত ঘৃণার এক বিকট পাথর তার বুকে চেপে বসে। চাকরিটা সে ছেড়ে দেয়। এই পরিস্থিতির ভয়াবহতা সে টের পায় কিন্তু–

> আমার অনুভূতি আর রক্তাক্ত স্নায়ুগুলো বহুকাল পর টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচছে।[২৬]

এভাবেই শেষ হয়েছে 'ক্রুশকাঠে কন্যা' উপন্যাস। নীলুফার, শায়লা, রঞ্জনের জীবনকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষের বাহ্যিক জীবনের সমান্তরালে প্রবাহিত একটি অন্তর্জগতের ছবি এঁকেছেন নাসরিন জাহান। সেখানে ভয়, ঘৃণা, কৃশতা, তুচ্ছতা, বেদনা, স্বপ্ন, প্রেম, ছায়াচ্ছন্নতার এক গভীর জগত কাব্যিক ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। আবার বাস্তব জীবনের অসহায়ত্ব, যন্ত্রণা, বেদনা, নিষ্ঠুরতা, যৌনতা, বিকারগ্রস্থতা, শ্রম ও ঘামের রূপায়ণও ঘটেছে একেবারে মেদহীন কঠিন ভাষায়।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের বিকার বিকৃতি দৈন্য নির্যাতন, ঘিন ঘিনে জীবন বাস্তবতার চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি নাসরিন জাহান জীবনের গভীর বোধ, সূক্ষ্ম চেতনা, পাপ-পূণ্যের সামাজিক হিসেবের বাইরে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানবিক বোধে জীবনকে উপলব্ধির প্রয়াস চালিয়েছেন। মানুষের যৌন জীবনকে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন নাসরিন জাহান 'ক্রুশকাঠে কন্যা' উপন্যাসে। এখানে তিনি একেবারে সংস্কারমুক্ত এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

একদিকে যাপিত জীবনের ধারাপাতে, নীলুফার মায়ের দাম্পত্য জীবনে নিষ্ঠুর ভয়ানকভাবে বেঁচে থাকায়, নীলুফার অস্তিত্বের সংকটে, গার্মেন্টসের কঠিন অসম্মানের লাঞ্ছনার জীবনে, চাকরির ধিক্কার বিকৃতিকে সহ্য করার চেষ্টায়, শুধুমাত্র আশ্রয় আর নির্ভরতার জন্য শায়েদের সাথে বিবাহের আপোশে, শায়লার গার্মেন্টসের মেয়েদের আমানবিক জীবন যাপনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও পুলিশের সাথে দেয়ালের আড়ালে গিয়ে আপোশ রফায়, বেঁচে থাকার তাগিদে অস্তিত্বের সংকটে হঠাৎ বিয়ে করায়, সায়রা বু, দিলারা বু'র দাম্পত্য জীবনযাপনের ক্লীশ ধারাবাহিকতায়, রঞ্জনের দায়িত্ব পালনের বেদনায় দগ্ধ হওয়াতে সামাজিক সত্যকে রূপায়িত করেছেন নাসরিন জাহান। অন্যদিকে তেমনি জীবনোপলব্ধির গভীর চেতনায় নীলুফার মায়ের সন্তানদের প্রতি গভীর ভালবাসায়, আশ্রয়দানের ও যুবতী কন্যার দিকে হাত না বাড়ানোর কৃতজ্ঞতায় শওকত মামার কাছে সমর্পণে, নীলুফার জীবনে সকল কুৎসিত, ভয়ংকরের পথে যাত্রায়ও রঞ্জনের প্রতি অন্তর্গত গভীর প্রেম-ভালবাসায়, সৌন্দর্যের অন্বেষণায়, রঞ্জনের জীবনের গভীর উপলব্ধিতে নীলুফারের মধ্যে অরূপ সৌন্দর্যের নির্মাণ শক্তিতে নাসরিন জাহান অঙ্কন করেছেন এক স্বপ্ন জগৎকে। আর পাঠককে সম্মুখীন করেছেন এক কঠিন সামাজিক বাস্তবতা ও গভীর জীবনোপলব্ধির স্বপ্নময়তার দ্বৈরথে।

উড়ুক্কু

নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনের কষ্ট, দারিদ্র, বিকৃতি, নারী জীবনের দুর্বিসহ অধীনতা, কুৎসিত আপোশ, মনোপীড়ন ও দ্বন্দ্ব এরই মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে লালনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটেছে নাসরিন জাহান রচিত 'উড়ুক্কু' উপন্যাসে, কেন্দ্রীয় চরিত্র নীনার জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে। নীনার মা, বোন রানু, ভাই আরেফিন, স্বামী রেজাউল, বন্ধু সত্যজিৎ, রঞ্জন, ওমর, সাবলেট পড়শী সানু, কামাল ভাই, বস্তিবাসী কাল্লুর মার জীবনের নানা সংকট উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের ক্লেদাক্ত সত্য অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক 'উড়ুক্কু' উপন্যাসে।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট বেলাতেই নীনা দেখেছে তার বাবা মার কুৎসিত ক্লিষ্ট ঘৃণ্য দাম্পত্য জীবন–

> আমার বাবা মার কুকুর কামড়াকামড়ি ঝগড়া দেখেছি। মনে পড়ে আমার ক্ষীণাঙ্গি, অসুস্থ মার সারা জীবনের যাবতীয় যন্ত্রণার একমাত্র উৎস ছিল অভাব। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মায়া-মমতা প্রেমের কোন কিছুই কোনদিন দেখি নি। তাদের কষ্টের মধ্যেও কোন গভীরতা ছিল না। ... প্রথম জীবনে অবশ্য মার মূল মানসিক কষ্টের কারণ ছিল এই ইরফান চাচা। তার আর মার সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বাবা মাকে এতো কুৎসিত কটুক্তি করেছেন আর এতো কিল থাপ্পর দিয়েছেন যে ধীরে ধীরে সব কিছুই তাঁর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ইরফান চাচা আর মার সম্পর্কটা আসলেই বিচ্ছিরি খোলামেলা এক ঘৃণিত সাবজেক্টে পরিণত হয়েছিল।[২৭]

কৈশোরে নীনা প্রেমে পড়েছিল ছবি আঁকিয়ে মহিমের। এই মহিমের হাত ধরেই পাঠজগতে প্রবেশ করেছিল নীনা। তার ভিতরে আজও যে সৌন্দর্যের সামান্য ধ্যানও অবশিষ্ট আছে তা এই মহিমের সংস্পর্শেই সে অর্জন করেছিল। কিন্তু বাস্তবের মহিম নীনার ছোট বোন রানুর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। নীনার ছবি আঁকতে গিয়ে নির্মাণ করেছে রানুর অবয়ব। বড় বিপন্ন বোধ করেছিল সেদিন নীনা।

এরপরে একদিন পূজা মন্ডপে তার পরিচিত অজয়ের আড়ালে ডেকে নিয়ে যাওয়া, বুকে হাত, ঠোঁটে চুম্বন, কষ্ট, তিক্ততা আর আবেশের অনুভূতি, এরপর হাতে গুঁজে দিয়ে যাওয়া আধুলির সুবাদে আপ্লুত হওয়া তার কৈশোর জীবনের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা।

তাদের প্রতিবেশী ভয়াতুর চেহারার অর্থবান মজুমদারকে নিয়ে সমাজে রয়েছে এক ধরনের দৈব বিশ্বাসের ধারণা। সে মানুষকে চড়া সুদে ঋণ দেয়। তার ঋণের জালে আটকে অনেকেই নিঃস্ব হয়েছে। কিন্তু তার আধিভৌতিক জীবনযাপন ও অর্থের কারণে কেউ তাকে বিশেষ ঘাটায় না। খুব ছোটবেলা থেকেই রানু মজুমদারকে ভয়ানক ভয় পেত। অবুঝ বয়েসেই তাকে দেখলেই চিৎকার করে কাঁদত। বিকৃত রুচির মজুমদারের মধ্যে বিষয়টি ভয়ানক প্রতিক্রিয়া তৈরী করে। রানুর কৈশোর বয়েসে সে রানুকে সম্মোহিত করে রানুকে নিয়ে এক ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠে। অদ্ভূত, ভয়ানক সব ঘটনা ঘটায় বানুর সামনে। এতেই অভ্যস্ত করে তোলে রানুকে। ভালো খাবার, কাপড়ের প্রলোভনেও আটকায় রানুকে। এক সময় ছুড়ে ফেলে রানুকে, কিন্তু ততদিনে ভিতরে একেবারে নিঃস্ব আর বদলে গেছে রানু। স্বাভাবিক জীবনে আর ফিরে আসতে পারে নি সে। সমাজে তাকে নিয়ে কুৎসার শেষ

Dhaka University Institutional Repository

থাকে না। রানুর জন্য প্রবল এক বেদনা অনুভব করে নীনা। তার সৌন্দর্যের কারণেই এখনও অনেকেই আসে রানুর কাছে। রানু তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরী করে, মেশে কিন্তু এদেরকে রানুর খুব বালক আর ম্যার ম্যারা মনে হয়। এখনও সে সেই–

> লাল বিশাল দুটো চোখ, লোমশ হাত আর কোমল থাবা খুঁজে।[২৮]

এভাবেই এক ভয়াল, কুৎসিত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে কৈশোর যৌবনের কোন সৌন্দর্যকেই না দেখে বড় হয়ে উঠেছে নীনা। নষ্ট হয়ে গেছে রানুর জীবন। নীনা এর মধ্যেই ছবি এঁকে আর বই পড়ার মধ্যে জীবনের সামান্য সৌন্দর্যকে ধারণের প্রাণপন সংগ্রাম করছে। মা সোনার কানের দুল পাশের বাড়ী থেকে কুড়িয়ে এনে বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন, নীনা তা বিক্রি করে ছবি আঁকার জন্য প্রথম কিছু সরঞ্জামাদি কিনেছিল। এই নিয়ে মার প্রবল খোঁজাখুজি ও বিপর্যস্ততায় বিপন্নবোধ করেছিল নীনা।

মহিমের ঘটনার আঘাতে নীনা ঝুকে পরে রেজাউলের দিকে। রেজাউলকে বিয়ে করে চলে আসে ঢাকায়। কিন্তু দৈন্যের হাত থেকে মুক্তি মিলে না। পাই পাই করে হিসেব করে চলেও শেষকুল রক্ষা করা যেতো না। এক তরকারি এক ভাত শুধু নয় রাতে ভাতটাও হিসেব করে খেতে হোত।

> মাসের শেষ দিকটা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। সংসারের হাল তখন গড়ের মাঠের মতো। দীর্ঘ ব্যবহারের ঝুরঝুরে বিছানার চাদরটা পাল্টালাম তো চাল শেষ। কোনোরকমে কেনা হোল আধা কেজি। ওদিকে তখন ক্রমেই শূন্যের কোঠায় নেমে আসছে মসলা, চিনি, বিস্কিট, সবজি। ধার করে কোনোরকমে একটা হসফস জোড়াতালি দিয়ে তার হাত থেকেও উদ্ধার পেয়ে যেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবো, ব্যাস, সন্ধ্যায় হঠাৎ করে ঘরের সবেধন নীলমনি বাল্বটা ফিউজ হয়ে গেলো। ...ভিখিরির আর ভয় কি, আকাশ তার বাবা, চাঁদ তার মামা, চেয়ে থাকতাম মোমের শিখাটার দিকে। আমার মতই পিরিচের উপর গলে গলে পড়ছে মমটা।[২৯]

বিয়ের আগে রেজাউলের মধ্যে নীনার উন্মাদনায় শিল্পিত হওয়ার যে চেষ্টা ছিল সংসারে ক্রমাগত পেষণে তা ম্লান হয়ে উঠতে থাকে। বিছানায় শুয়ে লুঙ্গি চাঙ্গে উঠিয়ে লম্বা করে শ্বাস টানা, নাক ঝেড়ে ময়লা মেঝেতে ছুড়ে ফেলা, প্রবল কৃপণতা, অফিস থেকে ফিরেই নীনার দিকে পিঠ দিয়ে পকেটের টাকার পাই পাই হিসেব, উপার্জন বাড়ানো বিষয়ে চরম আলসেমী, সকালে উঠে বিশ টাকা হাতে দিয়ে বেড়িয়ে যাওয়া, যেভাবে পার দুবেলা চালাও এই ভঙ্গি, বেড়ানোর ইচ্ছাও বাতিল করা রিকসা

Dhaka University Institutional Repository

ভাড়ার চিন্তায়। এরকম দুঃসহ অবস্থার পাশাপাশি তার কুৎসিত জান্তব জৈবিক ইচ্ছা সব কিছু ভিতরে ভিতরে নীনাকে একেবারে তিক্ত নিঃস্ব করে ফেলেছিল। বিয়ের রাতেই অদ্ভুত আচ্ছন্নতা নিয়ে মিলিত হয়েছিল সে রেজাউলের সাথে। অথচ তার সতীত্বের চিহ্ন দেখে আনন্দে নীনাকে চ্যাংদোলা করে শূন্যে তুলে ঘরময় চক্কর দেয় আর উল্লসিত চিৎকার করতে থাকে,

> হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি সেন্টপারসেন্ট সতী![৩০]

সেদিন এক অপরিসীম ঘৃণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল নীনা।

> তার মনে হয় সীতার অগ্নিপরীক্ষার গ্লানিময় বিবমিষায় সে রাতে আমারও ইচ্ছা হয়েছিলো ধরনীকে দু ফাঁক করি?[৩১]

সুখ দুঃখের অনুভূতিগুলো খুব ভোঁতা ছিল রেজাউলের। অফিস থেকে বাড়ী ফিরে ফ্যানের বাতাস খাওয়া, হাটুর উপর লুঙ্গী তুলে বিছানায় বসা, রাতের বেলা কুৎসিত ভঙ্গিতে দৈহিক বিষয়ের অবতারণা, মেস জীবনে তার সমকামিতা, পাশের বাড়ীর চঞ্চল কিশোরী মেয়েটি– রেজাউল যাকে স্নেহ করতো অফিস থেকে ফিরে যার সাথে খেলায় মেতে উঠত, একদিন নীনার সামান্য অনুপস্থিতিতে যখন খেলাচ্ছলে সেই মেয়ের বুক উরু শরীরে সব জায়গায় হাত চালায় সেই দিন থেকে ঘৃণায় রেজাউলের কাছ থেকে দূরে সরতে থাকে নীনা। মাতৃত্বের অনুভূতিতে ঘোর, সন্তান জন্মের পরপরই শরীরের জন্য রেজাউলের ঘৃণ্য লোলুপতা এই সবকিছু শেষ পর্যন্ত নীনাকে বাধ্য করে রেজাউলের সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে।

কি ভয়ানক দুঃসময় গেছে তার। ছোট ভাই আরেফিন একটা চাকরি জোগাড় করে দেয়ায় হাফ ছেড়ে বেঁচেছে সে। এর পরে একাকী টিকে থাকার তীব্র লড়াই– কামাল-সানু পরিবারের সাথে সাবলেট নেয় সে, এখানেও পানি, বিদ্যুৎ নিয়ে তিক্ততা, অফিসে কাজের নিষ্ঠার জন্য বসের সহযোগিতার মনোভাবকে পুরুষ সহকর্মীদের বাঁকা নজরে দেখা ও মন্তব্য করা, সানুর স্বামী কামালের বস্তির কাল্লুর মার সাথে অশালীন সম্পর্ক, এই নিয়ে তাদের দাম্পত্য কলহ ও পরে আপোশ– এ সব কিছু নীনার এ জীবনেও নিয়ে আসে ক্লান্তি। এদেশের মেয়েরা যে কত অসহায় তা স্বামীর সমকামিতা ও কিশোরী মেয়ের সাথে ঘৃণ্য আচরণের পরেও নীনা যেমন, তেমনি লম্পট স্বামীর সাথে সানুর আপোশের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন নাসরিন জাহান।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে যে বাড়ীতে নীনা ছাত্রী পড়ানোর কাজ পেয়েছিল সেই বাড়ীর চাকচিক্য, নরম নিটোল সবুজ চাকচিক্য, তাকে তার দীনতার জন্য কাঁদিয়েছিল।

ঘটনাক্রমে নীনার সাথে দেখা হওয়া এই উপন্যাসের ওমর চরিত্রের মাধ্যমে দারিদ্র্যের চরম রূপটি ওমরের কুমারী অন্তঃসত্ত্বা বোন, কাঁথা বানানোর অনুপযুক্ত শাড়ী মরা মা, সঙ্গদোষে ছুরিকাহত উন্মাদ ছোট ভাই-এর মধ্য দিয়ে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। ওমরের বেকারত্ব, যে কোন কাজ করতে ইচ্ছার মধ্য দিয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের টিকে থাকার লড়াইটাই ফুটে উঠেছে। নীনার বাড়ির পাশের বস্তিতে মাতাল স্বামীর লাথিতে কালুর মার মৃত্যুতে নিম্নবিত্ত মানুষের দীর্ণ বেদনার্ত জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে।

নীনার ছোট ভাই আরেফিনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব, নেতাদের আদর্শহীনতা, ছাত্রকর্মীদের হতাশা, কিন্তু জেগে উঠার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে এই সমাজেরই চিত্র স্পষ্ট হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক বিভেদের পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে যে অস্তিত্বের সংকট তৈরী করে নীনা-রেজাউলের বন্ধু সত্যজিৎ-এর কণ্ঠে তা আভাসিত হয়েছে–

> একজন মানুষের যখন দেশ থাকে না, তার মত রিক্ত ভিখারী আর কে আছে পৃথিবীতে।[৩২]

নীনার জীবনের চারপাশে এরকম বদ্ধ ক্লীষ্ট জীবনের পাশে ইরফান সাহেব যেন স্বস্তির আশ্বাস। ইরফান সাহেব, বাবার খালাতো ভাই, মার প্রেমিক। তাঁর সান্নিধ্য নীনার মধ্যে সৌন্দর্যবোধের উচ্চতর বিস্তার ঘটায়। নীনার ছবি আঁকায় উৎসাহ দিয়ে, তাকে বেড়াতে নিয়ে, জীবন নিয়ে নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে তার ভালো বন্ধু হয়ে উঠেন তিনি। তিনি নীনাকে বলেন,

> যদি সুখী হতে চাও, তাহলে দুঃখকে মাঝে মাঝে বুক থেকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নাও। তারপর তাকে সেই হাতের মুঠোয় নেড়ে চেড়ে পাশাপাশি বুকের মধ্যে জায়গা করে দাও আনন্দকে।...কিন্তু একদিনের জন্য দুঃখকে সমূলে সরাতে চেয়েছো তো আনন্দের ভানই হবে সার।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

রেজাউলের বন্ধু সত্যজিৎ, রঞ্জন, সালাদিনের সাথে সহজ বন্ধুত্ব ছিল নীনার। অন্তত এই জায়গায় রেজাউলের মধ্যে একটা আধুনিকতা ছিল, এ বিষয়টি কখনও বাঁকা চোখে দেখে নি সে। তার একাকিত্বের জীবনেও এরা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে রেখেছিল।

তালাকপ্রাপ্ত নারীর একাকী অবস্থানের নানামত্রিক সমস্যা, ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ কিংবা ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজনে বাড়িওয়ালার আচরণ ও গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়ার হুমকী– এইসব পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে একা নীনাকেই। বিচ্ছেদের পর, স্বামীরই সন্তান গর্ভে আসায় উৎকণ্ঠা, 'শিরদাঁড়া হিম-করা' ভীতি নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছে নীনা, সামাজিক বিচারে এ মিলন অবৈধ বলে, আত্মিক সম্প্রীতির অভাবে যাকে একদিন তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে, তারই কাছে পুনরায় ফিরে আসার কথা ভাবতে হয়েছে তাকে।[৩৪]

এভাবেই দুঃখ, দৈন্য, জটিলতা, আপোশ, লাম্পট্য, বিকৃতির চিত্রণের মধ্য দিয়ে নাসরিন জাহান অসংখ্য ঘটনা বিন্যাসের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত জীবনকে একটি বিস্তৃত ক্যানভাসে ধারণ করেছেন তাঁর 'উড়ুক্কু' উপন্যাসে। নীনার ভিন্ন গভীর জীবনবোধে, শিল্পীত সৌন্দর্যের অন্বেষণে, কুৎসিত জীবনের সাথে আপোশ করতে না চাওয়ার দৃঢ়তায় নারীর জীবনের গভীর এক উপলব্ধিকেই উদ্ভাসিত করেছেন নাসরিন জাহান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। রাবেয়া খাতুন, *এই বিরহকাল* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৯৫), পৃ. ১০

২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৪। ঐ

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৯। ঐ

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১১। ঐ

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৪। ঐ

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ.৪৮

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

১৯। নাসরিন জাহান, *ক্রুশকাঠে কন্যা* (অন্যপ্রকাশ, ঢাকা; ২০০৪), পৃ. ২৭

২০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

২১। ঐ

২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

২৭। নাসরিন জাহান, উড়ুক্কু (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ১৯৯৮), পৃ. ১১

২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

২৯। পূর্বোক্ত, পৃ.১৪

৩০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৩১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

৩৪। স্বপ্না রায়, *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচেতনা* (অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা; ২০০৬), পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ বিবর্তনের পরিপ্রক্ষিতে বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভব– এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের একটি মহত্তম প্রাপ্তি। কিন্তু সমাজ চৈতন্যের তথা মধ্যবিত্ত মানসের যে অতুচ্চ্য প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়, যুদ্ধোত্তর কয়েক বছরের মধ্যেই সে স্বপ্ন ভঙ্গের হতাশা জাতিকে নিক্ষিপ্ত করে অবসাদ, পরাভব চেতনা ও আত্মযন্ত্রণার মধ্যে। অনৈতিকতা, লুণ্ঠন প্রবণতা, লাম্পট্যের যে প্রসার ঘটে তাতে ঔপন্যাসিকদের মননশীল মনন হয় হতাশা আক্রান্ত, যন্ত্রণাবিদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালের সমাজ জীবনের অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের পটভূমিতে ঔপন্যাসিকগণ হলেন মগ্ন চৈতন্য আশ্রয়ী, নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধে নিমজ্জিত। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের দীর্ণ বেদনার্ত আত্মস্বরূপের রূপায়ণ এ পর্যায়ের উপন্যাসের প্রধান প্রবাহ।

মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দিলারা হাশেম, রিজিয়া রহমান, রাবেয়া খাতুনের উপন্যাসে এ বিষয়টি রূপায়িত হয়েছে। দিলারা হাশেমের 'ঘর মন জানালা', 'একদা এবং অনন্ত', 'আমলকীর মৌ' উপন্যাস এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, নীতিনৈতিকতাহীন মধ্যবিত্তের উত্থানের পাশাপাশি নারীর নিজস্ব জগত, সমাজ শৃংখল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নতুন জীবন বোধের চেতনায় উজ্জ্বল।

রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' উপন্যাসে স্বাধীনতাউত্তর জীবনবাস্তবতার দীর্ণ বেদনার্ত রূপায়ণ ঘটেছে সুসংহতভাবে। নারীর নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবন যন্ত্রণারও উন্মোচন ঘটেছে এ উপন্যাসে।

আত্মসত্তা, জাতিসত্তা সন্ধানের প্রচেষ্টা বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। ঔপন্যাসিকরা এই অনুসন্ধানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন বাঙালী জীবনের অতীত গর্ভে। বাংলার অতীত, চর্যাপদ কিংবা মনসা মঙ্গলের ঐতিহ্যকথা ও পূরাণ কাহিনীর মধ্যে সন্ধান করেছেন সমকালীন প্রতিবাদী মানসের শিল্প উপকরণ। এ ধারার গুরুত্বপূর্ণ মহিলা ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসগুলি হচ্ছে রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলা', 'একাল চিরকাল', 'অলিখিত উপাখ্যান', সেলিনা হোসেনের 'চাঁদ বেনে', 'নীল ময়ূরের যৌবন'।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা নিজ নিজ চেতনার মাত্রা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধ পরবর্তী মূল্যবোধের অবক্ষয় ও হতাশার বাস্তবতা অপ্রিয় সত্য ভাষণে উদ্ভাসিত করেছেন।

রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' ও 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী জীবন নির্মেদ বাস্তবতার প্রতিফলনে রূঢ়, রক্তাক্ত, বিভৎস। 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসে রিজিয়া রহমান তুলে ধরেছেন শতাব্দী পরম্পরায় প্রবহমান এই বদ্বীপে অবহেলিত, উপেক্ষিত, অধিকারহীন মানুষের যাপিত জীবন। উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে। সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' ও 'যুদ্ধ' উপন্যাসদ্বয় মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র বুড়ি তার সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে কি করে রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের তারই আখ্যান। আর 'যুদ্ধ' উপন্যাসে খণ্ড খণ্ড ঘটনার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন মানুষের সংগ্রামী চেতনা, প্রত্যয়ের দৃঢ়তা, বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন বিস্তৃত পরিসরে প্রকাশিত হয়েছে।

দিলারা হাশেমের 'একদা এবং অনন্ত' উপন্যাসে বেনু আপার স্বামী হারানো ও মুক্তিযুদ্ধে সন্তানের নারকীয় হত্যাকান্ড ব্যক্তিগত জীবনে যুদ্ধের ভয়াবহতাকে মূর্ত করেছে।

চা শ্রমিকদের জীবনের দৈন্য, বেদনা, সংগ্রাম, সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন রিজিয়া রহমান তাঁর 'সুর্য সবুজ রক্ত' উপন্যাসে। ধীবর জীবনের দারিদ্র্য, কষ্ট, সংগ্রাম, স্বপ্ন ও সজ্ঞচেতনার বিকাশে উজ্জ্বল সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' উপন্যাস। সাঁওতাল জীবনের রূপান্তর, দ্রোহ, নির্যাতন, সংগ্রাম চিত্রণে রিজিয়া রহমান 'একলা চিরকাল' উপন্যাসে যে সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অভিনব ও স্বতন্ত্র মাত্রায় উজ্জ্বল। বস্তিজীবনের বেঁচে থাকার কষ্ট, দৈন্য, ভাসমানতা, সহমর্মীতায় বিন্যস্ত হয়েছে রিজিয়া রহমানের 'ঘর ভাঙ্গা ঘর' উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

নিম্নমধ্যবিত্ত কর্মজীবী ও গার্মেন্টস শ্রমিক নারীর জীবনের ক্লেদ, গ্লানি, ক্লিশ জীবন ও যৌনতার রূপায়ণের মাধ্যমে নাসরিন জাহানের 'উড়ুক্কু' ও 'ক্রুশকাঠে কন্যা' ও রাবেয়া খাতুনের 'এই বিরহকাল' উপন্যাসের ঘটনাক্রম এগিয়ে গিয়েছে। এই উপন্যাসগুলিতে নারীর একান্ত নিজস্ব সংগ্রাম ও কুৎসিত বেদনার্ত জীবন যাপনের চিত্র মেদহীন রূঢ় ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শৈল্পিক উচ্চতায় উন্মোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাসে দেশ বিভাগ পূর্ববর্তী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সোমেন চন্দ ও দেশ বিভাগ পরবর্তী শিক্ষিত উদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মুনির চৌধুরীর ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে সেলিনা হোসেন সেকালের মধ্যবিত্ত মানসের দ্রোহ চেতনার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এভাবেই বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকেরা বিষয় বৈচিত্রের বিশিষ্টতায়, সমাজ বাস্তবতা রূপায়ণের দক্ষতায়, জীবনউপলব্ধির গভীর অন্বেষায়, নাগরিক জীবনের ক্লেদ আর অবক্ষয়ী জীবন যন্ত্রণার উন্মোচনে ও নারীর একান্ত নিজস্ব সংগ্রাম ও নব জীবনবোধের প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে অর্জন করেছেন বিশিষ্ট স্থান।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ক. মূলগ্রন্থ

দিলারা হাশেম : *ঘর মন জানালা* (মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮০)

একদা এবং অনন্ত (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৯৭)

আমলকীর মৌ (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ঢাকা; ১৯৯৯)

রাবেয়া খাতুন : *বায়ান্ন গলির এক গলি* (নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা; ১৯৮৮)

এই বিরহকাল (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৯৫)

রিজিয়া রহমান : *ঘর ভাঙা ঘর* (মৃদুলা প্রকাশন, ঢাকা; ২০০৭)

রক্তের অক্ষর (সাহিত্য বিলাস, ঢাকা; ২০০৩)

বং থেকে বাংলা (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; ২০০০)

সূর্য সবুজ রক্ত (সাহিত্য বিলাস, ঢাকা; ২০০৪)

একাল চিরকাল (সাহিত্য বিলাস, ঢাকা; ২০০৪)

সেলিনা হোসেন : *যাপিত জীবন* (মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮১)

চাঁদবেনে (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; ২০০৫)

পোকামাকড়ের ঘরবসতি (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ২০০৭)

নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; ২০০৭)

নাসরিন জাহান : *উড়ুক্কু* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ১৯৯৮)

ক্রুশকাঠে কন্যা (অন্যপ্রকাশ, ঢাকা; ২০০৪)

Dhaka University Institutional Repository

খ. সহায়ক-গ্রন্থ

অচ্যুত গোস্বামী — *বাংলা উপন্যাসের ধারা* (কল্লোল প্রকাশনী, ঢাকা; ২০০৪)

আবুল কাসেম ফজলুল হক — *সাহিত্য চিন্তা* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৫)

আবুল কাসেম ফজলুল হক — *রাষ্ট্রচিন্তায় বাংলাদেশ* (কথাপ্রকাশ, ঢাকা; ২০০৮)

আবুল ফজল — *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৭৪)

আনু মুহম্মদ — *নারী পুরুষ ও সমাজ* (সন্দেশ, ঢাকা; ২০০৫)

আমিনুর রহমান সুলতান — *বাংলাদেশের উপন্যাস: নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ২০০৩)

আহমদ শরীফ — *বিশ শতকে বাঙালী* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ২০০১)

আহমদ শরীফ — *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; ২০০৪)

আহমেদ শরীফ — *সংস্কৃতি ভাবনা* (উত্তরণ, ঢাকা; ২০০৪)

অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় — *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা; ১৯৮৭)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — *কালের প্রতিমা* (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; ১৯৯১)

এ কে খন্দকার
মঈদুল হাসান ও
এস আর মির্জা — *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর - কথোপকথন* (প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা; ২০০৯)

কল্যাণ মিরবর — *বাংলাদেশের উপন্যাস - চার দশক* (পুস্তক বিপণি, কলকাতা; ১৯৯২)

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী — *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য* (দেশ পাবলিশিং, কলকাতা; ১৯৮৬)

গিয়াস শামীম — *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০২)

Dhaka University Institutional Repository

দেবীপদ ভট্টাচার্য — *উপন্যাসের কথা* (কলকাতা; ১৯৬১)

দেবেশ রায় — *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে* (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; ১৯৯৪)

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ — *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট* (শিকড়, ঢাকা; ২০০১)

ড. শহীদ ইকবাল — *বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস* (আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা; ২০০৮)

নাজমা জেসমিন চৌধুরী — *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* (মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৯১)

ফকির আশরাফ সম্পা. — *স্বাধীনতা উত্তর সাহিত্য* (বাণী প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৮৫)

ফরিদা সুলতানা — *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৯)

বদরুদ্দীন উমর — *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* (সুবর্ণ, ঢাকা; ১৯৯৩)

বদরুদ্দীন উমর — *বাঙলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি* (আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা; ১৯৯৭)

বিশ্বজিৎ ঘোষ — *বাংলাদেশের সাহিত্য* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯১)

মঈদুল হাসান — *মূলধারা '৭১* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ২০০৪)

মালেকা বেগম — *বাংলার নারী আন্দোলন* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ২০০২)

মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী — *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৮৫)

রফিকউল্লাহ খান — *বাংলাদেশের উপন্যাস- বিষয় ও শিল্পরূপ* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — *রবীন্দ্র সমগ্র চতুর্থ খন্ড* (পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ; ২০১১)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; ১৯৯২)

Dhaka University Institutional Repository

সুদক্ষিণা ঘোষ	*মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা* (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; ২০০৮)
স্বপ্না রায়	*বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচেতনা* (অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা; ২০০৬)
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (সাহিত্যশ্রী, কলকাতা; ১৯৭১)
সেলিনা হোসেন	*স্বদেশে পরবাসী* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৩)
সেলিনা হোসেন বিশ্বজিৎ ঘোষ, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত	*সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ২০০৭)
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পা.	*বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ২০০৮)
রফিকউল্লাহ খান	*বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৭)
রণেশ দাশগুপ্ত	*বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপ* (কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৭৩)